প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য হইতে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন
জীবন ও সামাজিক আচার ব্যবহারের পরিচয়

বেদের ভাষার উচ্চারণে প্রথম লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পদমধ্যে একটি ভিন্ন যাবতীয় স্বর অনুদাত্ত। একটিমাত্র স্বর উদাত্ত। * সুতরাং যে সকল স্থলে ব্যাকরণ শাস্ত্রে কোনও একটী স্বরের মাত্রা লক্ষিত হইবে, সেই সকল স্থলে ঐ পদমধ্যে অন্য যে সকল স্বর থাকিবে, তাহাদেরও উচ্চারণ লক্ষিত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। অতঃপর স্বর-প্রকরণ হইতে আমরা প্রশ্নবাচক বাক্যে উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিব।

প্রশ্নবাচক বাক্যে সত্য শব্দ থাকিলে তিঙন্ত পদের স্বরমাত্রার ব্যতিক্রম ঘটিবে না। †

"সত্য শব্দের যোগে প্রশ্নবাচক বাক্যে স্বরমাত্রার ব্যতিক্রম ঘটিবে না" এই বিধান হইতে আমরা ইহা বেশ বুঝিতে পারি যে, সত্য শব্দের যোগ না থাকিলে ধাতু-স্বরের ব্যতিক্রম ঘটিত। এ বিষয়ে সাধারণ বিধি এই যে, ধাতুর অন্ত্য স্বর উদাত্ত হয়। ‡

আবার প্রত্যেক ধাতু ও প্রত্যেক শব্দ এবং প্রত্যেক প্রত্যয়ের জন্য ব্যাকরণে স্বরের মাত্রা বিহিত হইয়াছে। সুতরাং এখানে বিহিতের ব্যতিক্রম না হওয়াকে উল্লেখযোগ্য করিয়া সূত্রকার নিঃসন্দেহ ইহাই জানাইতেছেন যে, প্রশ্নবাচক বাক্যে ধাতুস্বরের মাত্রার সাধারণতঃ ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। কিন্তু সেই অভিপ্রায় কোনও সূত্রবিশেষে তিনি প্রকাশ করিয়া বলেন নাই। বলিলে আমাদের আলোচনার সুবিধা হইত বটে, কিন্তু না বলিবার কারণ কি? তাহা অনুমান করিবার চেষ্টা আমাদের পক্ষে বৃথা।

যদি ক্রিয়ার পূর্ব্বে উপসর্গ বা নেতিবাচক শব্দ না থাকে এবং যদি বাক্যে কিম্

---

* অনুদাত্তং পদমেকবর্জম্ ।৬।১।১৫৮॥

পরিভাষেয়ম্। স্বরবিধিবিষয়া। যস্মিন্ পদে যস্যোদাত্তঃ স্বরিতো বা বিধীয়তে তমেকমচং বর্জয়িত্বা শেষং তৎপদম্ অনুদাত্তচকং স্যাৎ। গোপায়তং নঃ। অত্র সনাদ্যন্তাঃ ইতি ধাতুত্বে ধাতুস্বরেণ যকারাকার উদাত্তঃ শিষ্টমনুদাত্তম্। "সতি শিষ্টস্বরবলীয়স্ত্বম্ অন্যত্র বিকরণেভ্য ইতি বাচ্যম্—বার্ত্তিকসূত্রম্। তেনোক্তোদাহরণে। উপেধাতুস্বর আয়স্ত প্রত্যয়স্বরশ্চ ন শিষ্যতে। অন্যত্র ইতি কিম্। যজ্ঞং যজ্ঞমভিদ্ধে গৃণীতঃ। অত্র শিষ্টোঽপি শ্না ইত্যত্র স্বরো ন শিষ্যতে কিন্তু তস এব॥

পদমধ্যে একটী ভিন্ন অবশিষ্ট যাবতীয় স্বর উদাত্ত হইবে। যে স্থানে একটী স্বরের উদাত্তত্ব বা স্বরিতত্ব বিহিত হইবে, সে স্থলে ঐ পদস্থিত অন্য স্বরসমূহের মধ্যে আর কোনটীই উদাত্ত বা স্বরিত হইবে না—অর্থাৎ সবগুলিই অনুদাত্ত হইবে। গোপায়তং নঃ (ঋগ্বেদ, ৬।৭৪।৪।) এই বাক্যে গোপায়তং পদে 'য' স্বরের উদাত্তত্ব বিহিত হওয়ায় অবশিষ্ট যাবতীয় স্বর অনুদাত্ত হইয়াছে।

† সত্যং প্রশ্নে ।৮।১।৩২। সত্যযুক্তং তিঙন্তং নানুদাত্তং প্রশ্নে। সত্যং ভোক্ষ্যসে। প্রশ্নে কিম্। সত্যমিদ্ধা উ তং বয়মিন্দ্রং স্তবাম॥

‡ ধাতোঃ ।৬।১।১৬২। অন্ত উদাত্তঃ। গোপায়তং স্যাৎ নঃ। অসি সত্যঃ॥

শব্দের যোগ থাকে, তবে জিজ্ঞাসাবাচক বাক্যের ক্রিয়াপদের স্বরের ব্যতিক্রম হয় না।* এখানেও ব্যতিক্রম না হওয়ার কারণ বা স্থল অতি সতর্কভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। আবার এই বিধি করিয়াই সূত্রকার এই বিধিরও একটী ব্যতিক্রম লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"কিম্ শব্দের প্রয়োগ না থাকিলে বিকল্পে ধাতুস্বর বজায় থাকিবে।" † এই সূত্রের উদাহরণে তিনি স্পষ্টই দেখাইতেছেন যে, 'পচতি' ক্রিয়ার আদিস্বর উদাত্ত হইলেও প্রশ্নবাচক বাক্যে তাহার অন্যথা কিমর্থে এবং কিম্ শব্দের অপ্রয়োগে বিকল্পে বিহিত হয়। আর একটা কৌতূহলোদ্দীপক বিধি এই স্থলে প্রণীত হইয়াছে। চিৎ শব্দের যোগে কিম্ শব্দ ক্রিয়াপদের স্বর ব্যতিক্রম সাধনে অসমর্থ। ‡ কিম্ শব্দের সহিত চিৎশব্দের যোগ হইলে তৎসহযোগে যে বাক্য রচিত হয়, তাহা অনিশ্চয়াত্মক হইলেও জিজ্ঞাসাবাচী নহে। সুতরাং জিজ্ঞাসাবাচী বাক্যই যে ক্রিয়াপদের স্বর-ব্যতিক্রমের কারণ, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকিতেছে না। অথচ পাণিনি আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সাদা কথাটা পরিষ্কার ভাষায় বলিলেন না। তবে যেরূপ ভাষায় বলিয়াছেন, তাহাতে ব্যতিরেক-মুখে হইলেও কথাটা তিনি পরিষ্কার করিয়াই বলিয়াছেন বলিতে হইবে। এক্ষণে ধাতু বা ক্রিয়াপদ ছাড়িয়া দিয়া বাক্যের উচ্চারণে প্রশ্ন-জন্য কি পরিবর্ত্তন হয়, তাহা গ্রহণ করিয়া আমরা ব্যাকরণাচার্য্য পাণিনিকে অব্যাহতি দান করিব। পাণিনি লক্ষ্য করিয়াছেন যে, প্রশ্নবাচক বাক্যে (বা প্রশংসা বুঝাইলে) বাক্যান্তস্থিত স্বরের প্লুত বা অনুদাত্ত উচ্চারণ হয়। § এই সূত্রে ভট্টোজি দীক্ষিত সূত্রস্থিত অনুদাত্ত শব্দের অর্থ 'প্লুত' লিখিয়াছেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত-কৌমুদীর অনুবাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসু বলেন যে, কাহারও কাহারও মতে এখানে অনুদাত্ত শব্দের প্লুত অর্থ নহে।** অনুদাত্ত শব্দের অর্থ প্লুত হউক আর নাই হউক অথবা বিকল্পেই হউক, তাহা লইয়া অধিক আলোচনা আবশ্যক মনে করি না। আমাদের আলোচনার অনুকূল এইটুকু নিঃসন্দেহে পাইতেছি যে, জিজ্ঞাসাবাচক বাক্যের অন্ত্য স্বরের উচ্চারণে একটু বৈশিষ্ট্য ছিল অর্থাৎ

---

* কিং ক্রিয়া প্রশ্নেঽনুপসর্গমপ্রতিষিদ্ধম্ ।৮।১।৪৪। ক্রিয়াপ্রশ্নে বর্ত্তমানেন কিংশব্দেন যুক্তং তিঙন্তং নানুদাত্তম্। কিং দ্বিজঃ পচত্যাহোস্বিৎ গচ্ছতি। ক্রিয়া ইতি কিম্। সাধনপ্রশ্নে মাভূৎ। কিং ভক্তং পচত্যপূপম্বা। প্রশ্নে কিম্। কিং পঠতি। ক্ষেপোঽয়ম্। অনুপসর্গং কিম্। কিং প্রপচতি উত প্রকরোতি। অপ্রতিষিদ্ধং কিং। কিং দ্বিজো ন পচতি।

† লোপে বিভাষা ।৮।১।৪৫। কিমোঽপ্রয়োগে উক্তং বা। দেবদত্তঃ পচত্যাহোস্বিৎ পঠতি।

‡ কিং বৃত্তং চ চিদুত্তরম্ ।৮।১।৪৮।

§ অনুদাত্তং প্রশ্নান্তাভিপূজিতয়োঃ ।৮।২।১০০।

** According to some this rule does not ordain pluta, but only ordains the anudattaness of those syallables which become pluta by the previous rules, VIII. 2. 84., etc. The meaning of the sutra then is :—That pluta which comes at the end of an interrogative sentence or a sentence denoting admiration, is anudatta.

সাধারণতঃ বাক্যান্তস্থিত স্বরের যেরূপ উচ্চারণ হইত, জিজ্ঞাসাবাচী বাক্যে সেরূপ হইত না। এই প্রকরণেই পাণিনি একটী বাক্য উদ্ধৃত করিয়া, তাহার অন্ত্য স্বর অনুদাত্ত ও প্লুত হইবে, এই বিধান করিতেছেন।—উপরিস্বিদাসীদিতি চ।৮।২।১০২। এই বাক্যটি ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে (১০।১২৯।৫) আছে। এখানেও বাক্যটি সম্ভবতঃ জিজ্ঞাসাবাচী—অধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ। কিন্তু রমেশ দত্ত অনুবাদ করিয়াছেন,—নিম্নের দিকে ও উর্দ্ধদিকে বিস্তারিত হইল। স্থানটি সৃষ্টি-প্রকরণে দর্শনশাস্ত্রমূলক আলোচনা বুঝাইয়া দিতেছে এবং স্বিং শব্দও জিজ্ঞাসাবাচী। ইহার পরেও অনেকগুলি জিজ্ঞাসাবাচক বাক্য একত্র আছে। সুতরাং আমরা অনুমান করি, বাক্যটি সম্ভবতঃ জিজ্ঞাসাবাচক। পাণিনিও বোধ হয়, ইহার অর্থ বুঝিতে পারেন নাই ; কিন্তু শিষ্ট-প্রয়োগ হইতে উচ্চারণটি লক্ষ্য করিয়াছেন। নতুবা জিজ্ঞাসাবাচী বাক্যের জন্য সাধারণভাবে যে সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার পক্ষে এই সূত্রের আবশ্যকতা ছিল না। আমরা জিজ্ঞাসাবাচী বাক্যের তালিকায় এ বাক্যটি দিই নাই।

এ স্থলে আর একটি সূত্রে (৮।২।১০৫) পাণিনি বলিতেছেন যে, জিজ্ঞাসা বুঝাইলে কেবল বাক্যান্তস্বর কেন, যাবতীয় পদান্ত স্বরই স্বরিত ও প্লুত হয়। এই সূত্রের প্রভাবে (৮।২।১০০) সূত্র বিকল্পসূত্রে পরিগণিত হইতেছে।

এ পর্য্যন্ত আমরা যে আলোচনা করিয়াছি, তাহাতেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের দেশে বৈদিক যুগ হইতে এ কাল পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসাবাচী বাক্যের একটা উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য আছে। সেই উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য না থাকিলে ভাষায় জিজ্ঞাসার ভাব প্রকাশ পায় না। বাক্যে জিজ্ঞাসাবাচক শব্দ থাকিলেও এই উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য জিজ্ঞাসার ভাব প্রকাশ করিবার জন্য একান্ত আবশ্যক। সুতরাং এই উচ্চারণ-ভঙ্গীকে আমরা জিজ্ঞাসার ভাষার প্রাণ-স্বরূপ বলিতে পারি। কারণ, জিজ্ঞাসাবাচক শব্দের প্রয়োগ না করিয়াও কেবলমাত্র এই উচ্চারণ-ভঙ্গীদ্বারা আমরা জিজ্ঞাসার ভাব প্রকাশ করিতে পারি। যথা,—'তুমি যাবে।' ও 'তুমি যাবে?'

এই যে উচ্চারণ-ভঙ্গী, যাহা দ্বারা আমরা জিজ্ঞাসার ভাব ভাষায় প্রকাশ করিয়া থাকি, তাহা লিখিয়া বুঝাইবার যোগ্য বর্ণমালা আমাদের নাই। আমাদের কেন, আমাদের দেশেত নাই ; সুসভ্য ইউরোপ-খণ্ডেও নাই। বর্ত্তমান কালে ইংরাজি ভাষার জিজ্ঞাসা-বাচক (?) চিহ্ন আমাদের দেশের সকল ভাষাতেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু প্রাচীন কালে অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষার যুগে জিজ্ঞাসার ভাষা লিখিয়া বুঝাইবার জন্য এই সামান্য কৌশলটীও ছিল না। অথচ এই চিহ্ন দ্বারা উচ্চারণের ভঙ্গীও প্রকাশ পায় না। জিজ্ঞাসাবাচক (?) এই চিহ্নে আমরা এইমাত্র বুঝি যে, বাক্যটী জিজ্ঞাসাবাচক এবং সেই বোধ হইবামাত্র আমাদের অভ্যাস-অভ্যস্ত রীতিতে আমরা জিজ্ঞাসাসূচক উচ্চারণভঙ্গী সহকারে বাক্যটী পাঠ করিয়া থাকি।

এই প্রসঙ্গে আর একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। জিজ্ঞাসার প্রাণস্বরূপ এই যে উচ্চারণভঙ্গী, ইহা সকল ভাষাতেই একরূপ। আমরা বাঙ্গালা ভাষায় "তুমি কোথায় ছিলে?" উচ্চারণ করিতে যে প্রকার বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করি, ইংরাজেরা "Where had you been?" উচ্চারণ করিতেও সেইরূপ উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করেন। আবার পারসীকগণ, ازكجا مي ائي ? (আজ্ কুজা মি আঈ? কোথায় হইতে আসিলে?) উচ্চারণ করিতেও সেই একই প্রকার অবলম্বন করেন। এই প্রকার যে সকল ভাষাকে ইণ্ডো-ইউরোপীয়, ইণ্ডো-জর্ম্মণ বা আর্য্য আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে, সেই সকল ভাষাতে এই উচ্চারণভঙ্গী এক প্রকার। সাঁওতালেরা অনার্য্য জাতি। তাহাদিগকে এই একই প্রকার স্বরে "দাকা জমায়ে?" (ভাত খাইয়াছ?) বলিতে শুনিয়াছি। Caldwell তাঁহার দ্রাবিড়ীয় ব্যাকরণে এ উচ্চারণ লক্ষ্য করেন নাই। সম্ভবতঃ দ্রাবিড় ভাষাতেও উচ্চারণভঙ্গী এই প্রকার। চীনদেশের ভাষা, আফ্রিকার নিগ্রোজাতির ভাষা, আমেরিকার আদিম জাতিগণের ভাষা, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপসমূহের ভাষা, তথা হিব্রুভাষার উচ্চারণ লক্ষ্য করিয়া লিপিবদ্ধ করিলে একটী অভিনব তথ্যের আবিষ্কার হয়। এ বিষয়ে ভাষাতত্ত্বজ্ঞগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম। কারণ, এরূপ তুলনা-মূলক তথ্যের আবিষ্কারে বহু ব্যক্তির সমবেত চেষ্টা আবশ্যক।

এক্ষণে স্বাভাবিক প্রশ্ন এই হইতেছে যে, প্রশ্নবাচক বাক্য সকল ভাষাতেই এই একভাবে উচ্চারিত হয় কেন? এই উচ্চারণের ভঙ্গী সকল ভাষাতেই সমভাবে প্রবেশ লাভ করিল কি প্রকারে? স্বভাবতঃ এই উচ্চারণভঙ্গীর কোনওরূপ অর্থপ্রকাশের শক্তি আছে কি? এই সকল প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে আমাদের এই উচ্চারণ-প্রণালীটী বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হয়। যে বাক্যটী জিজ্ঞাসাবাচী, বিস্ময়বাচী বা সম্বোধনবাচী নহে, তাহা উচ্চারণ করিবার সময় আমরা উচ্চারণের একটা স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম মানিয়া চলি। বাক্যের আরম্ভ, মধ্য ও শেষে একটা প্রকৃতিসিদ্ধ ক্রম লক্ষ্য করা যায় এবং ইহাও লক্ষ্য করা যায় যে, বাক্যের অবসানের পর আর কোনওরূপ আকাঙ্ক্ষার ভাব থাকে না। যখন বাক্য শেষ হয়, তখন তাহা অসম্পূর্ণতার ভাব প্রকাশ করে না। কিন্তু জিজ্ঞাসার ভাষায় ইহার ব্যতিক্রম পরিস্ফুট। জিজ্ঞাসার বাক্যের উচ্চারণে একটা অসম্পূর্ণত্ব, একটা আকাঙ্ক্ষার ভাব, একটা অপরের প্রতীক্ষা স্বাভাবিক ভাবে ফুটিয়া উঠে। বাক্যটা যেন সম্পূর্ণ হইল না, মাঝখানে ভাঙ্গিয়া গেল এবং সম্পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষায় শ্রোতার উত্তর প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়া গেল। অর্থাৎ জিজ্ঞাসাবাচক বাক্যটী সম্পূর্ণ বাক্য নহে, সাকাঙ্ক্ষ বাক্য, তাই সম্পূর্ণতার জন্য অন্যের নিকট কিছু চাহিয়াই অর্দ্ধপথে থামিয়া যায়। ইহার আরম্ভ, মধ্য ও অবসান স্বাভাবিক ক্রমে না হইয়া উচ্চারণের মধ্যে এমন একটা গতিশক্তি প্রবর্ত্তিত হয়, যাহা বাক্যের অবসান অংশে একটা অস্বাভাবিক কম্পন উৎপাদন করিয়া, শ্রবণেন্দ্রিয়ে একটা ঝড় উঠাইয়া দেয়। এই প্রকার উচ্চারণভঙ্গীকে আমরা জিজ্ঞাসার জন্য অতি স্বাভাবিক ও অতি প্রাচীন প্রণালী

বলিয়া মনে করি। এটা এক প্রকার ভাষার ইঙ্গিত বা সঙ্কেত। এখানে সঙ্কেতমাত্র দ্বারাই জিজ্ঞাসার ভাব ব্যক্ত হয়। এইরূপ সার্ব্বজনীন সঙ্কেত আমরা অনেক ব্যবহার করিয়া থাকি। পুনঃ পুনঃ শিরঃকম্পন একটা অশান্তির লক্ষণ। তাই এই প্রকার শিরঃকম্পন ভাষার অভাবে অসম্মতির জ্ঞাপক হইয়াছে। আমরা অধিকাংশ সময়েই 'না' কথাটা মুখে না বলিয়া এই প্রকার সঙ্কেত দ্বারা ব্যক্ত করিয়া থাকি। আবার ধীরভাবে আরামের সহিত এক পার্শ্বে মাথাটা অবনত করা শান্তি বা আরামের লক্ষণ। তাই এই প্রণালী সঙ্কেতের ভাষায় সম্মতির জ্ঞাপক হইয়াছে; 'হাঁ' বলিবার পরিবর্ত্তে আমরা প্রায়ই এই সাঙ্কেতিক ভাষার ব্যবহার করি। এবং এই সাঙ্কেতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চক্ষুর্দ্বয় অর্দ্ধমুদ্রিত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মানসিক সম্মতির জ্ঞাপন করে। চক্ষু ও মুখমণ্ডলের রক্তিমা যেমন ক্রোধাদির ব্যঞ্জক, এই প্রকার সাঙ্কেতিক ভাষাও সেই প্রকার স্বাভাবিক। হাতের পাঁচটী অঙ্গুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিয়া, হস্ততালু ঊর্দ্ধমুখ করিয়া হাতটী ঘুরাইলে "জানি না" বলা হয়। এই প্রকার অনেক সাঙ্কেতিক ভাষা লক্ষ্য করা যাইতে পারে, যাহা ইংরাজ, ফরাসী প্রভৃতি জাতি হইতে বাঙ্গালী, জাপানী পর্য্যন্ত সকলেই বুঝিয়া থাকে। সুতরাং এই সঙ্কেতসমূহ অতি স্বাভাবিক ও অতিপ্রাচীন। আমাদের জিজ্ঞাসাবাচক বাক্যের উচ্চারণ-প্রণালীও এইপ্রকার অতি স্বাভাবিক ও অতি প্রাচীন সাঙ্কেতিক ভাষা। ইহা এত প্রাচীন যে, ব্যাকরণকারগণ এই উচ্চারণ-প্রণালীতে নিতান্ত অভ্যস্ত বলিয়া ইহার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। লিপিবিদ্যা ইহার উচ্চারণ লিখিয়া ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করে নাই। কেবল যখন শব্দবিন্যাস-প্রণালীতে ইহার জন্য অভিনব সংস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে, তখন ইহার পরিচয়সূচক একটী (?) চিহ্ন মাত্রের সৃষ্টি করিয়াছে।

বিষয়টী যেরূপ অনালোচিত ও উপেক্ষিতভাবে পড়িয়া আছে, তাহাতে যোগ্যতর ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের দ্বারা ইহার আলোচনা বাঞ্ছনীয়। আমরা কেবলমাত্র বিষয়ের অবতারণাদ্বারা বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য হইতে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবন ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের পরিচয়

১। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য ধর্ম্মমূলক। ভারতীয় আর্য্যসভ্যতার একটা বিশিষ্টতা ছিল। তাহার লক্ষ্য ছিল—ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের মধ্যে ধর্ম্মভাবের বিকাশ করিয়া তোলা। আমাদের গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনে যে সকল কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, ধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়াই তাহাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এমন কি, আমাদের রাজনীতি ও যুদ্ধবিগ্রহ পর্য্যন্ত ধর্ম্মের প্রভাব এড়াইতে পারে নাই। তাই মন্বাদি যে সকল সংহিতামূলে আমাদের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হইত, তাহাদিগের নাম ছিল 'ধর্ম্মশাস্ত্র'। তাই আমাদের প্রাচীন সাহিত্যমাত্রই ধর্ম্মমূলক—আমাদের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য-শিল্প ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত। তাই দেব-প্রতিমা গঠনেই আমাদের দেশের শিল্পিগণের শিল্পচাতুর্য্য পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে—দেব-মন্দির নির্ম্মাণে স্থপতিগণের নৈপুণ্য সিদ্ধিলাভ করিয়াছে—কবি ও সাহিত্যিকগণের লেখনী-মুখেও কেবল ধর্ম্মের কাহিনীই ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।

২। বিভিন্ন ধর্ম্মমতগুলির প্রচারের উদ্দেশ্যেই প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের সৃষ্টি। প্রচীন বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস ও প্রকৃতি বুঝিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে আমাদের দেশের ধর্ম্মমতগুলির উত্থান-পতনের ইতিহাসের খবর লইতে হইবে। কারণ, এই ধর্ম্মমত-গুলির উত্থান-পতনের সহিত আমাদের প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। পাঠান-বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে এ দেশে সেনবংশীয় ভূপতিগণ রাজত্ব করিতেন। সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ বিজয়সেনদেব ধর্ম্মে শৈব ছিলেন১। তৎপুত্র মহারাজ বল্লালসেন-দেবও ধর্ম্মমত সম্বন্ধে পিতৃমতানুগামী ছিলেন ২। বল্লালের পর যিনি গৌড়েশ্বর হইলেন, তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মানুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইনি বল্লালপুত্র মহারাজ লক্ষ্মণসেনদেব। লক্ষ্মণসেনের 'তর্পণদীঘির' তাম্রশাসনের প্রারম্ভে এই কারণেই আমরা 'ওঁ নমঃ শিবায়'

১। বিজয়সেনের দেবপাড়া-শিলাপ্রশস্তির প্রথমে "ওঁ নমঃ শিবায়" এইরূপ বচন আছে। উক্ত প্রশস্তি পাঠেও জানা যায়, তিনি শৈব ছিলেন। তাঁহার 'বৃষভশঙ্কর-গৌড়েশ্বর" উপাধি ছিল (বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসন দ্রষ্টব্য)।

২। বল্লালসেনের সীতাহাটী তাম্রশাসনের প্রারম্ভে "ওঁ নমঃ শিবায়" লেখা আছে এবং ঐ তাম্রশাসনের উপরে 'সদাশিব' মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। ঐ শাসনে অর্দ্ধনারীশ্বর মহাদেবের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করা হইয়াছে। তাঁহার 'নিঃশঙ্কশঙ্করগৌড়েশ্বর' উপাধি ছিল (দানসাগর)।

বচনের পরিবর্ত্তে 'ওঁ নমঃ নারায়ণায়' বচন দেখিতে পাই। আবার এই কারণেই বৈষ্ণব কবি জয়দেব গোস্বামীকে আমরা তাঁহার রাজসভায় অধিষ্ঠিত ও সমাদৃত দেখিতে পাই।

লক্ষ্মণসেনদেবের রাজত্বের শেষভাগে গৌড়রাষ্ট্র পাঠানগণকর্ত্তৃক বিজিত হয়। সেনবংশের পূর্ব্বে পালবংশীয় রাজগণ গৌড়েশ্বর ছিলেন। তাঁহারা ধর্ম্মে বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহাদের তাম্রশাসনসমূহের প্রারম্ভে "ওঁ নমো বুদ্ধায়" এইরূপ বচন উৎকীর্ণ থাকা পরিদৃষ্ট হয়। যত দিন এ দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম রাজধর্ম্ম ছিল, তত দিন অন্যান্য ধর্ম্মমতসমূহ এ দেশে সহজে মস্তকোত্তোলন করিতে পারে নাই। তারপর যখন শৈব ও বৈষ্ণবধর্ম্ম রাজধর্ম্মের আসন গ্রহণ করিল, তখন হইতেই এ দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের সূত্রপাত হইল—প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়া গেল এবং বৌদ্ধধর্ম্মাচার্য্যগণ ব্রাহ্মণগণের হস্তে নিগৃহীত হইতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে যখন এ দেশে শৈব ও বৈষ্ণবধর্ম্ম রাজার আশ্রয় লাভ করিয়া গৌড়মণ্ডলে প্রভাব বিস্তার করতঃ মুমূর্ষু বৌদ্ধধর্ম্মকে পদদলিত করিয়া সদর্পে অগ্রসর হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে গৌড়মণ্ডলে এক অভিনব ঘটনার স্রোতঃ প্রবাহিত হইল এবং তাহার 'নিমিত্তকারণ' হইল পাঠান বিজেতাগণ।

পাঠানগণের যে ধর্ম্মমত, তাহার সহিত এ দেশীয় বৌদ্ধ, শৈব কিংবা বৈষ্ণব, কোন মতেরই সামঞ্জস্য ছিল না এবং পাঠান বিজেতাগণও এ দেশের সকল ধর্ম্মমতের সহিতই তুল্যরূপ সহানুভূতিশূন্য ছিল। তাহারা দেশজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই এতদ্দেশীয় সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মগুলির এক সাধারণ আখ্যা প্রদান করিল—তাহা 'হিন্দুধর্ম্ম'। তাহার ফলে এই হইল যে, এ দেশীয় সকল ধর্ম্মমতগুলিকেই এক সমতলে আনিয়া দাঁড়াইতে হইল। পূর্ব্বে যেমন রাজার আশ্রয় লাভ করিয়া এ দেশীয় এক প্রকার ধর্ম্মমত অপর ধর্ম্মমতকে বিপন্ন করিতে সমর্থ হইত, এখন তাহারা সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত হইল এবং 'হিন্দুধর্ম্ম' রূপ সাধারণ নামের আবরণে নব নবভাবে, নবীন সাজে নিজ নিজ ধর্ম্মাচার্য্য ও ভক্তগণের সহায়তায় মস্তকোত্তোলনে প্রয়াসী হইল। এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্ম 'ধর্ম্মপূজার' ছদ্মবেশে, বৌদ্ধ শক্তিসমূহ লৌকিক চণ্ডী ও বিষহরি প্রভৃতি নামের আবরণে আত্মপ্রতিষ্ঠার নবোদ্যমে প্রবৃত্ত হইল—শৈব, বৈষ্ণব, নাথপন্থীগণও নিজ নিজ মতের প্রতিষ্ঠা স্থাপনে অগ্রসর হইল—এমন কি, প্রাচীন সৌরগণ পর্য্যন্তও স্বকীয় মত প্রচারে উদ্যত হইল। তৎকালে সমাজের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহাতে গীতিকাব্যের ভিতর দিয়া ধর্ম্মপ্রচার করাই সহজসাধ্য ছিল। সুতরাং ধর্ম্মাচার্য্যগণ সাধারণের বোধগম্য ভাষায় আপনাপন ধর্ম্মমত-সমূহের ও ইষ্টদেবদেবীগণের গৌরব ঘোষণ পূর্ব্বক গীতিকাব্যের রচনায় ও প্রচারে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে সদ্ধর্ম্মীগণ বৌদ্ধজগতের ভাব লইয়া 'শূন্যপুরাণ', নাথপন্থীগণ 'মাণিকচাঁদের' ও 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত'[১] ও 'গোরক্ষবিজয়' নামক গীতি কাব্য, শৈবগণ নানাপ্রকার শিবায়ন,

১। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় দুইটী কারণে এই দুইটা গীতিকাব্যকে খৃষ্টীয় শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী মনে করেন। প্রথম, মাণিকচন্দ্র রাজার গীতে কড়ি দ্বারা রাজকর আদায়ের কথা আছে। দ্বিতীয়, তিরুমলয়ে উৎকীর্ণ শিলালিপি পাঠে জানা যায়, মহারাজ রাজেন্দ্রচোল বঙ্গদেশের রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজয় করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রচোল ১০৬৩ হইতে ১১১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন; গোবিন্দচন্দ্র তাঁহার সমসাময়িক

শাক্তগণ বিবিধ চণ্ডীমঙ্গল, পদ্মাপুরাণ ও শীতলার গীতি, সৌরগণ সূর্য্যের পাঁচালী, বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণব পদাবলী ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রভৃতি রচনা করিলেন। প্রকৃত পক্ষে এই সকল গীতিকাব্যই পাঠান বিজয়ের পরবর্ত্তী প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের মৌলিক রচনা বলিয়া পরিগণিত। এই সময় আর এক শ্রেণীর বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ, গুণরাজ খানের 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', কাশীরাম দাসের মহাভারত, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি এই শ্রেণীর সাহিত্যের অন্তর্গত এবং সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের অনুবাদ ও চৈতন্যদেবের জীবনী অবলম্বনে এই শ্রেণীর সাহিত্য সংগঠিত। পাঠান বিজয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের যে সকল বাঙ্গালা রচনার সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা "বৌদ্ধগান ও দোহা"[১] নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। কতকগুলি ডাকের বচন ও খনার বচনের মধ্যেও ঐ কালের বাঙ্গালা রচনার নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ তৎকালে বেদপন্থী ব্রাহ্মণগণ বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহাদের ধর্ম্মমত লিপিবদ্ধ করিতেন না এবং একমাত্র বৌদ্ধগণই প্রাদেশিক ভাষায় তাঁহাদের মত প্রচার করিতেন। বোধ হয়, এই নিমিত্তই পাঠান-বিজয়ের পূর্ব্বকালীন ঐ সকল বাঙ্গালা রচনাসমূহ কেবলমাত্র বৌদ্ধধর্ম্ম-মূলক।

এইরূপে ধর্ম্মমতসমূহের গৌরব প্রচারোদ্দেশ্যে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য জন্ম ও পুষ্টি লাভ করায় তাহাতে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-প্রণালী ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের কথা বিশেষভাবে স্থান লাভ করে নাই। এমন কি, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের

এবং মাণিকচন্দ্র তৎপূর্ব্বে রাজত্ব করেন। মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই গীত রচিত হইবার কথা। দীনেশ বাবুর প্রথম প্রমাণ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, কড়ি যে কেবল হিন্দু-রাজত্বেই রাজকর-স্বরূপ গৃহীত হইত, তাহা নহে; মুসলমান-রাজত্বের শেষভাগ পর্য্যন্ত এই প্রথার প্রচলন ছিল। শ্রীহট্ট প্রদেশের কড়ির ভার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারিবর্গকে পর্য্যন্ত উত্ত্যক্ত করিয়াছিল। দ্বিতীয় প্রমাণ সম্বন্ধে এই বলা যাইতে পারে, তিরুমলয় লিপির রাজেন্দ্রচোল ১০৬৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন প্রাপ্ত হন নাই, তিনি ১০১২ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বের ত্রয়োদশ বৎসরে অর্থাৎ ১০২৪ খৃষ্টাব্দে তিরুমলয় শিলালিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। তিরুমলয়ের গোবিন্দচন্দ্র ও মাণিকচাঁদের পুত্র গোপীচাঁদ বা গোবিন্দ-চন্দ্রকে এক মনে করিবার কোন হেতু দেখা যায় না। গোবিন্দচন্দ্রের গীতে পাওয়া যায়,—"সুবর্ণচন্দ্র মহারাজা ধাড়িচন্দ্রের পিতা। তার পুত্র মাণিকচন্দ্র শুন তার কথা॥" অর্থাৎ সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র ধাড়িচন্দ্র, তৎপুত্র মাণিকচন্দ্র। মাণিকচন্দ্রের পুত্র গোবিন্দচন্দ্র। আবার শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসন অনুসারে পূর্ণচন্দ্রের পুত্র সুবর্ণচন্দ্র, তৎপুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র, তৎপুত্র শ্রীচন্দ্র। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,—'বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী অনুসারে বঙ্গের চন্দ্ররাজবংশের সহিত ময়নামতীর বা গোপীচাঁদের গানে উল্লিখিত রাজগণের কোন সম্পর্কই এখন পর্য্যন্ত স্বীকার করা যাইতে পারে না' (বাঙ্গালার ইতিহাস)। গ্রীয়ার্সনের মতে মাণিকচাঁদের গান খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রচিত। উহাই সম্ভবতঃ ঠিক অনুমান।

১। খ্রীষ্টীয় ৭ম হইতে ১০ম শতকের মধ্যে বিরচিত এই সকল গান ও দোহা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "বৌদ্ধগান ও দোহা" নাম দিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন।

২। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে কবিকঙ্কণ চণ্ডীর রচনা শেষ হয়। যথা,—

"শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥"—(কঃ চঃ, ৮)।

বিরচিত "কবিকঙ্কণ চণ্ডী" বাদ দিলে এই শ্রেণীর গার্হস্থ্য ও সামাজিক চিত্র প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে কুত্রাপি পরিস্ফুটভাবে অঙ্কিত পরিদৃষ্ট হয় না।

৩। পাঠান-বিজয়ের পূর্ব্বকালীন রচনায় বাঙ্গালীর দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবনের প্রসঙ্গ। এই সময় ধর্ম্মের সূক্ষ্ম উপদেশ গ্রহণের জন্য লোকে গুরুকরণ করিত[১]। ব্রহ্ম, ঈশ্বর, অর্হৎ, বৌদ্ধ, লোকায়ত ও সাঙ্খ্যমতগুলির সহিত পাশাপাশি অবস্থান করিয়া 'সহজিয়া ধর্ম্ম'-মত লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল। এই মতে ভাবও নাই, অভাবও নাই, সকলই শূন্যরূপ অর্থাৎ ভব ও নির্ব্বাণে কোনও প্রভেদ নাই—দুই-ই এক; সুতরাং সহজিয়ারা অদ্বয়বাদী[২]। এখনকার ন্যায় তখনও 'ব্রহ্মবাদী' ব্রাহ্মণগণ জাতিভেদের নিত্যত্ব স্বীকার করিতেন এবং চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ বর্ণকেই উত্তম বলিয়া প্রচার করিতেন, অগ্নিহোত্র করিতেন, চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতেন, দণ্ডীবেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কিন্তু সহজিয়ারা এই জাতিভেদ ও ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রভৃতি স্বীকার করিতেন না[৩]। যাহারা "ঈশ্বর ধর্ম্ম" মানিত, তাহারা গায়ে ছাই মাখিত, মাথায় জটা ধারণ করিত, প্রদীপ জ্বালিয়া ঘরে বসিয়া থাকিত, গৃহের ঈশান কোণে বসিয়া ঘণ্টাধ্বনি করিত, আসন করিয়া বসিত, চক্ষু মিট্-মিট্ করিত, কাণে খুস্-খুস্ করিত ও লোকদিগকে ধাঁধাঁ দিত। অনেক রণ্ডী (অর্থাৎ স্বামিরহিতা), মুণ্ডী ও নানাবেশধারী লোক ইহাদের মতে চলিত[৪]। ক্ষপণকগণ কপট মায়া-জাল বিস্তার করিয়া লোক ঠকাইত, মলিন বেশ ধারণ করিত, নিজ শরীরকে কষ্ট দিত, নগ্ন হইয়া থাকিত, কেশোৎপাটন করিত ও ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করিত[৫]। বৌদ্ধ স্থবিরগণের কাহারও দশ শিষ্য, কাহারও কোটি শিষ্য থাকিত, তাহারা গেরুয়া কাপড় পরিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া লোক ঠকাইত, মহাযানীদিগের কেহ কেহ পুস্তক নকল করিত, কিন্তু তাহার অর্থ বুঝিত না[৬]। লোকে পুষ্করিণী খনন, বর্ত্ম নির্ম্মাণ, বৃক্ষ রোপণ ও মঠ-প্রতিষ্ঠাকে

১। "দিট করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ।"—(চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়)

২। অপণে রচি রচি ভব নির্ব্বাণা।
মিছে লোঅ বন্ধাবএ অপণা।"—(চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়)
"অদ্বঅ চিত্ত তরুঅর করাউ তিহুঅণেঁ বিত্থা [র]
করুণা ফুল্লিঅ ফল ধরই নামে পর উআর।"—(সরোজবজ্রের দোঁহাকোষ)

৩। বৌদ্ধ গান ও দোঁহা, ৮১—৮৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৪। ঐ, ৮৪—৮৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৫। বৌদ্ধ গান ও দোহা, ৮৬—৮৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৬। ঐ, ৮৮—৮৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

পুণ্যকার্য্য বলিয়া মনে করিত১। স্বর্গকামী ব্যক্তিগণ অন্নদান, জলদান, স্বর্ণদান, ভূমিদান ও কন্যাদান করিত২। এই সময় বাঙ্গালী গৃহস্থ ভালরূপ গৃহস্থালী জানিত। সুশীলা গৃহস্থ-বধূরা অতিথি সেবা করিত, স্বামীর প্রতি ভক্তিমতী ছিল, রৌদ্রের সময় (গ্রীষ্মকালে) কাঁটা-কুটা দ্বারা রাঁধিত, বর্ষার জন্য খড়-কাঠ বাঁধিত, কাঁকে কলসী লইয়া ঘাটে জল আনিতে যাইত৩। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, "কৃষক, সারাজীবন পরিশ্রম করিয়া, রৌদ্র-বৃষ্টি সহ্য করিয়া যে সত্যের আভাস পাইয়াছিল, সেই সব জ্ঞান [খনার বচনে] প্রচুর আছে। কৃষক জানিত, জ্যৈষ্ঠে খরা ও আষাঢ়ে ধারা হইলে শস্য ধরায় আঁটে না, আষাঢ় মাস ভরিয়া দক্ষিণা বাতাস বহিলে সে বৎসর বন্যা হয়, ফাল্গুন মাসে বৃষ্টি হইলে চিনা কাওন দ্বিগুণ হয়, ধান্যের থোর জন্মিলে একমাস, ফুলিলে অর্থাৎ গর্ভে শীষ জন্মিলে ২০ দিন, ঘোড়ামুখো অর্থাৎ শীষভরে আনত হইলে ১৩ দিন পরেই কাটিবার উপযুক্ত হয়। অগ্রহায়ণে কাটিলে পূর্ণ ফসল হয়, পৌষে কাটিলে স্থানে স্থানে ফসল, মাঘে কাটিলে অল্পমাত্র ফসল এবং ফাল্গুনে কাটিলে কৃষকের কোন ফসল হয় না। এখনও বঙ্গের কৃষক এই সব তত্ত্ব জানে, কিন্তু পূর্ব্বে ঘরে ঘরে সকলেই ইহা জানিত। কিন্তু এই সব বচনের অপর একটা দিক্ দেখিবার আছে। দৃষ্ট হইবে, বাঙ্গালী গৃহস্থালী করিতেছিল সত্য, কিন্তু টিক্‌টিকির ভয়ে, হাঁচির ভয়ে, আকার ভয়ে, বাঁকার ভয়ে, কুঁজোর ভয়ে, স্বীয় কুটীরে থাকিয়া জড়সড় হইয়াছিল। পা বাড়াইতে, হাঁ

১। ধর্ম্ম করিতে যবে জানি
পোখরি দিয়া রাখিব পানি।
গাছ রুইলে বড় কর্ম্ম
মণ্ডপ দিলে বড় ধর্ম্ম।—(ডাকের বচন)

২। যে দেয় ভাত শালা পানী শালী।
সে না যায় যমের বাড়ী।
স্বর্ণ ভূমি কন্যা দান।
বলে ডাক স্বর্গে স্থান।—(ডাকের বচন)

৩। অতিথি দেখিয়া মরে লাজে।
তবু তার পূজায় সাজে।
সুশীলা শুদ্ধ বংশে উৎপত্তি।
মিঠা বোল স্বামীতে ভকতি।
রৌদ্রে কাঁটা কুটায় রাঁধে।
খড় কাঠ বর্ষাকে বাঁধে।
কাখে কলসী পানিকে যায়।
হেট মুণ্ডে কাকহো না চায়।
যেন যায় তেন আইসে।
বলে ডাক গৃহিণী সেই সে।—(ডাকের বচন)

করিতে বঙ্গীয় বীর পাঁজির দোহাই দিত, তাহারা কাকমুখে জ্যোতিষের বার্ত্তা শুনিয়া কার্য্যের ফলাফল নির্ণয় করিত১।"

৪। পাঠান-বিজয়ের পর হইতে চণ্ডীদাসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়ে রচিত বাঙ্গলা সাহিত্যে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবনের প্রসঙ্গ। পাঠান-বিজয়ের অব্যবহিত পরে বিরচিত২ শূন্যপুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই সময় ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধ সদ্ধর্ম্মীগণের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিতেছিল৩। এই জন্য পাঠানগণ যখন ব্রাহ্মণগণের দেবমন্দির প্রভৃতির উপর উৎপাত আরম্ভ করিল, তখন সদ্ধর্ম্মীরা আনন্দিত হইয়াছিলেন। এই সময় পাঠান বিজেতাগণ মাথায় কাল রঙ্গের টুপী পরিত, হাতে 'তিরুচ কামান' ধরিত এবং অশ্বে আরোহণ করিয়া মন্দিরসমূহ আক্রমণপূর্ব্বক ধ্বংস করিত ও চতুর্দ্দিকে লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইত৪। এই সময়ে বিরচিত মাণিকচাঁদ ও গোপীচাঁদের গান হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালে পুরুষেরা মাথায় পাকড়ী ধারণ করিত৫; ধনশালী লোকেরাও 'বাঙ্গালা ঘরে' বাস করা পছন্দ করিত৬; তাহারা শয়নের জন্য 'শীতল মন্দিরে' 'পালঙ্গ' ব্যবহার করিত এবং গ্রীষ্মকালে 'শীতল পাটিতে' শয়ন করিয়া, বালিসে হেলান দিয়া 'দণ্ড পাথার' বাতাস উপভোগ করিত৭।

১। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন-বিরচিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃঃ ৮৩-৮৪ (তৃতীয় সংস্করণ)।

২। দীনেশ বাবুর মতে 'শূন্যপুরাণ"-রচয়িতা রামাই পণ্ডিত খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিদ্যমান ছিলেন (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃঃ ৬১)। আমরা নানা কারণে দীনেশ বাবুর মত গ্রহণ করিতে অপারগ। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, 'রমাই ঠাকুরের ছড়াগুলি নিশ্চয়ই মুসলমান অধিকারের পরে লেখা হইয়াছিল (বৌদ্ধগান ও দোহা— মুখবন্ধ, পৃঃ ২ দ্রষ্টব্য)। আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের মতাবলম্বী।

৩। "মালদহে মাগে কর   না চিনে আপন পর
জালের নাহিক দিস পাস।
বলিষ্ঠ হইল বড়   দশ বিশ হয়্যা জড়
সদ্ধর্ম্মিরে করএ বিনাস।"—(শূন্যপুরাণ, নিরঞ্জনের রুষ্মা)

৪। "ধর্ম্ম হইলা জবনরূপি   মাথাএত কাল টুপি
হাতে শোভে তিরুচ কামান।
চাপিয়া উত্তম হয়   ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া একনাম।
দেউল দেহারা ভাঙ্গে   কাড়্যা কিড়্যা খায় রঙ্গে
পাখড় পাখড় বোলে বোল।
ধরিয়া ধর্ম্মের পায়   রামাঞি পণ্ডিত গায়
ই বড় বিসম গণ্ডগোল।" (শূন্যপুরাণ)

৫। 'কার জন্য পাকড়ি রাখিছ মস্তক উপর।' (মাণিকচাঁদের গীত, ৩৫২ শ্লো)

৬। "বান্দিলাম বাঙ্গলা ঘর নাই পড়ে কালী। (মা, চা, গী)

৭। "কারে লাগিয়া বান্দিলাম শীতল মন্দীর ঘর।
পালঙ্গে ফেলাইব হস্ত নাই প্রাণের ধন।
সিতল পাটি বিছাইয়া দিমু বালীসে হেলান পাও।
গ্রীস কালে বদনত দিমু দণ্ড পাথার বাও।" (মা, চ, গী)

কৃষাণেরা দেড় বুড়ি কড়িতে এক মাস হাল চষিয়া দিত; দেড় বুড়ি কড়ি খাজনা দিলে ছয় মাস জমির ফসল উপভোগ করা যাইত; 'সরুয়া নলের বেড়া'র ঘরে লোকে শয়ন করিত; যে সামান্য একটু যত্ন করিত, তাহার দুয়ারেই 'ঘোড়া বাঁধা' পড়িত এবং বান্দীরাও 'পাটের পাছড়া' পরিধান করিতে পাইত[১]; 'ইন্দ্রকঙ্কণ' বিলাস-সামগ্রীর মধ্যে পরিগণিত হইত[২]; 'ইন্দ্রমিঠা' নামক এক প্রকার মিষ্টদ্রব্য[৩] ও 'বংশহরির গুয়া'[৪] উপাদেয় বলিয়া ব্যবহৃত হইত। এই সময় স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত অক্ষক্রীড়াসক্ত ছিল। সন্তান জন্মিলে সাত দিন পরে 'সাদিনা', দশ দিন পরে 'দশা' এবং ত্রিশ দিন পরে 'ত্রিশা' নামক উৎসব হইত[৫]। ব্রাহ্মণাদি জাতির পক্ষে যেমন উপবীত ধারণ কর্ত্তব্য, ধর্ম্মঠাকুরের পূজক-সম্প্রদায়মধ্যে তেমনি 'তাম্রধারণ' কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত ছিল[৬]। গৃহস্থেরা গায়ে তৈল ব্যবহার করিত এবং 'কাঁথার' প্রচলন ছিল[৭]। বড়লোকেরা 'শিতল চন্দন' ও 'চামরের বাতাস' উপভোগ করিত[৮]। নগরে জ্যোতিষী ব্রাহ্মণ 'পাঁজি হাতে' ভ্রমণ করিত[৯]। লোকে সন্ন্যাসী ভিখারীকে 'চাউল, কড়ি, হরিদ্রা ও লবণ' ভিক্ষা দিত[১০]। 'গয়ায় পিণ্ডদান', 'ব্রাহ্মণ ও গুরুজনের সেবা', 'দেবতা ও ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠা', দিঘী সরোবর খনন ও জাঙ্গাল নির্ম্মাণ প্রভৃতি পুণ্যকার্য্য বলিয়া গণ্য হইত[১১]। জুগীরা

১। "মাণিকচাঁদ রাজা বঙ্গে বড় সতী।
হালখানায় মাসড়া সাধে দেড়বুড়ি কড়ি॥
দেড় বুড়ি কড়ি লোকে খাজনা যোগায়।
তার বদলী ছয় মাস পাল খায়॥
এত মাণিকচন্দ্র রাজা সরুয়া নলের বেড়া।
একতন যেকতন করি যে খাইছে তার দুয়ারত ঘোড়া॥
বিনে বান্দি নাহি পিন্দে পাটের পাছড়া॥ (মা, চ, গী)

২। মা, চ, গী (৫৫৫ শ্লো)। ৩। ঐ (২২৫ শ্লোঃ)। ৪। ঐ (২৫৭ শ্লোঃ)।

৫। মা, চ, গী দ্রষ্টব্য। ৬। শূন্যপুরাণ দ্রষ্টব্য।

৭। "তৈল বিনে সুখ্ খ তনু বস্ত্র বিনে কাঁথা"—(গো, চ, গীত, ২৯৪ শ্লোঃ)।

৮। "শিতল চন্দন তেজি চামরের বায়।"—(গো, চ, গী, ২৯৩ শ্লো)

৯। "পাজি হাথে ডাক্যা বলে জুতিষ ব্রাহ্মণ"—(গো, চ. গীত, ৩০১ শ্লোঃ)

১০। "সর্ণ থালে চালু কড়ি হরিদ্রা লবণ॥—জুগীর নিকটে গেলা হরিস বদন॥"—(গো, চ, গী, ৩২৪ শ্লোঃ)

১১। "না করিল পিতৃকার্য্য গয়ায় দান পিণ্ড। পিতা মাতা তাহার ভুঞ্জিতে নরক কুণ্ড ॥৪৮৮
ব্রাহ্মণ লজ্ঘয়ে যেবা আর গুরুজন। ব্রাহ্মণহিংসার পাপ না হয় গনন॥ ৪৮৯
দেবতা ব্রাহ্মণ যেবা করিবে স্থাপন। সেই পুণ্যে অতি সত্য বৈকুণ্ঠে গমন ॥৩০৩
দিঘি সরোবর জেবা দিয়াছে জাঙ্গাল। জন্মান্তরে সেই জন হয় মহিপাল॥ ৫০৪—(গো, চ, গীত)

ক্ষুরে মস্তক মুণ্ডিত করিয়া, কর্ণে কুণ্ডল ধারণ করিয়া, গায়ে বিভূতি মাখিয়া, কটিতে কৌপিন বাঁধিয়া, কাঁধে কাঁথা ঝুলি লইয়া বেড়াইত[১]। ধনবানের গৃহিণীরা হার, কেয়ূর, কঙ্কণ, বেসর, নূপুর ব্যবহার করিত এবং সধবা স্ত্রীলোকগণ মাথায় 'সিন্দূর' পরিত[২]। প্রাতঃকালে উঠানে 'ছড়া' দিবার প্রথা ছিল[৩]; স্ত্রীবধ মহাপাপ বলিয়া গণ্য হইত[৪]। বালক-বালিকারা পাঠশালায় অধ্যয়ন করিত[৫], বড় লোকেরা শ্বেত চামরের বাতাস, অগৌর চন্দনের প্রলেপ ও কর্পূর সহিত তাম্বুল উপভোগ করিত, বহুসংখ্যক দাস-দাসী রাখিত[৬] এবং পাথরের দেওয়াল ও লোহার কপাটবিশিষ্ট অট্টালিকায় বাস করিত[৭]।

৫। চণ্ডীদাসের সময় হইতে শ্রীচৈতন্য-সাহিত্যের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত সময়ে বিরচিত বাঙ্গালা সাহিত্যে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবনের প্রসঙ্গ। কবি চণ্ডীদাস খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত কালে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। চণ্ডীদাসের পদাবলী ও 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন' শিক্ষিত-সমাজে সুপরিচিত। কবি কৃত্তিবাস ১৪৩২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রামায়ণের সহিত বঙ্গদেশের আবাল-বৃদ্ধবনিতার পরিচয় আছে। বিজয় গুপ্ত পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে হোসেন সাহ নরপতির শাসনকালে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি 'পদ্মাপুরাণ' নামক কাব্যের রচয়িতা। ইহাঁরা সকলেই শ্রীচৈতন্যসাহিত্যের অভ্যুদয়ের

১। "সুবর্ণের খুরেতে মুড়ায় মাথার কেষ। কর্ণেতে কুণ্ডল দিয়া হইল জুগী বেষ ॥
বিভূতি মাখিল গায় কটীতে কপিন। কাথা ঝুলি কান্দে করি হইল উদাসিন ॥"
—(গো, চ, গীত, ৬৪৫-৬৪৬ শ্লোঃ)

২। খসাইয়া পেলে হার কেয়ুর কঙ্কন। অভিমানে দুর করে যত আভরণ ॥
নাকের বেশর পেলে পায়ের নপুর। পুছিয়া পেলিল সবে সিথার সিন্দুর ॥
—(গো, চ, গীত, ৭০৪-৭০৫ শ্লোঃ)

৩। "রজনী প্রভাতে পড়ে চন্দনের ছড়া।" (গোঃ চ গীত, ১৯৯ শ্লোঃ)

৪। "স্ত্রী বধ মহাপাপ যুন আগম পুরানে।" (ঐ, ১৮৪ শ্লোক)

৫। "পাঠশালে পড়ি আমি জাই নিকেতন।" (ঐ, ৬৯ শ্লোক)

৬। "সেত চামরে কেহ করিছে বাতাস।
অগৌর চন্দন কেহ লেপে সর্ব্বগায়।
কপূর্র সহিত কেহ তাম্বুল যোগায়।" (ঐ ৩৩-৩৪ শ্লোঃ)

৭। "পাষান দেয়াল ঘরের লোহার কপাট।" (ঐ ৯৩ শ্লোঃ)

পূর্ব্বকালীন কবি। ইঁহাদের রচনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তৎকালে 'বাসুলী' প্রভৃতি গ্রাম্যদেবতার পূজা রজকিনীতেও করিতে পারিত[১]; নীচজাতীয়া রমণী-সংসর্গে উচ্চজাতীয় পুরুষের জাতিপাত হইত[২]; আবার ব্রাহ্মণ-সমাজ ইচ্ছা করিলে সেই পতিতকে উদ্ধারও করিতে পারিত[৩]; এই সময় 'সীতামিশ্রী', 'আলফা' প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্যের প্রচলন ছিল[৪], সধবারা সিঁথিতে সিন্দুর, বাহুতে বলয় ও শঙ্খ এবং পায়ে নূপুর পরিত[৫]; 'সাতেসরী' নামক হার ও কেয়ূর ব্যবহার করিত[৬]; অঙ্গে কাঁচুলী ধারণ করিত[৭]; খোঁপা বাঁধিত ও তাহা পুষ্পদ্বারা ভূষিত করিত[৮]; নয়নে কাজল দিত[৯]; বাহকেরা দড়ি ও বেঁড়ুয়া দ্বারা শিকা প্রস্তুত করতঃ বাহুকের সাহায্যে ভার লইয়া যাইত[১০]; মাথায় এক প্রকার ছাতি ধরিয়া আতপ-তাপ ও বর্ষার ধারা হইতে মস্তক রক্ষা করিত[১১]; গোয়ালারা হাটে দধি, দুগ্ধ, ঘোল, ঘৃত বিক্রয় করিত[১২]; পাত পাতিয়া ভাত খাইত[১৩]; রমণীরা কাঁকে কলসী লইয়া ঘাটে জল আনিতে যাইত[১৪] নেতের অর্থাৎ রেসমের কাপড় পরিত[১৫]; ললাটে তিলক, কানে কুণ্ডল,

---

১। "অল্প বয়সে, দুঃখিনী রামিনী, সেবাতে নিযুক্ত হোল।"—(চণ্ডীদাস)

২। "ধোবিনী সহিতে চণ্ডীদাস তাথে জাতিপাত হ'ল ছাড়া"—(চণ্ডিদাস)

৩। "শুন শুন চণ্ডীদাস। তোমার লাগিয়া আমরা সকলে ক্রিয়াকাণ্ডে সর্ব্বনাশ।
তোমার পিরীতে আমরা পতিত, নকুল ডাকিয়া বলে।
ঘরে ঘরে সব কুটুম্ব ভোজন, করিয়া উঠাব কুলে।"
"সকল ব্রাহ্মণ করাব ভোজন সকলে দিলেক পান।
সকলের মূল সামগ্রী করিলে আমি হই পরিত্রাণ।"—(চণ্ডিদাস)

৪। চণ্ডীদাস পদাবলী দ্রষ্টব্য।

৫। "চঞ্চল নয়ন তোর সিসতে সিন্দুর। বাহুত বলয়া শোভে পাএত নূপুর।"—(শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন)
"বাহুর বলয়া মো করিব শঙ্খচুর" (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, পৃঃ ৮৮)

৬। "ছিণ্ডিয়া পেলাইবো বড়ায়ি সাতেসরী হার"—(ঐ, পৃঃ ৮৮)

৭। "কাঞ্চলী ভাঙ্গিয়াঁ, তন বিগুতিল, ছিড়ি সাতেসরীহারা।" (ঐ)

৮। "খোঁপাত লুলয়ে তোর মোলঙ্গের মাল।" (ঐ পৃঃ ৭৯)

৯। "কাল কাজল নয়ান না লও"—(ঐ ৯২ পৃঃ)

১০। "সুদৃঢ় বন্ধন কৈল দুয়ি শিকিয়া। তলত গাঁথিল তার দুগুটি বেণ্ডুয়া।
বাহুক যোড়িয়া গেলা যমুনার পারে।"—(ঐ ১৬৯ পৃঃ)

১১। "খঁটি করি রাধার মাথাত ধর ছাতী।"—(ঐ ১৯৭ পৃঃ)

১২। "দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল হাটে না বিকাএ। এবে গোআলার গেল জীবন উপায়।" (ঐ পৃঃ ২০১)

১৩। "পাত পাতিয়াঁ কেহ্নে নাহি দেহ ভাত।" (ঐ পৃঃ ২১৩)

১৪। "কাখেত কলসী করি বড়ায়ি তুলে। চলীইলা চন্দ্রাবলী যমুনার কূলে।"—((ঐ ২৫৯ পৃঃ)

১৫। "নেত ধড়ি পরিধানে" (ঐ পৃঃ ২৬৯)।

পায়ে মগর খাড়ু, নূপুর, কানে হীরক-খচিত 'কড়ি' নামক কর্ণাভরণ, বাহুতে বাহুটী, পদাঙ্গুলীতে 'পাসলী' ব্যবহার করিত[১]; পর্য্যঙ্কে শয়ন করিত[২]; অম্বল, শাক, পটল ভাজা, নিমঝোল প্রভৃতি ব্যঞ্জনের প্রচলন ছিল এবং ঝাল-বাটা দিয়া ব্যঞ্জন রাঁধা হইত[৩]; ভাদ্র শুক্লা-চতুর্থীর চাঁদ দেখিলে, পূর্ণ কলসীতে হাত পুরিলে, এবং মাটির উপর জলের আঁক পাড়িলে বৃথা কলঙ্কের আশঙ্কা করিত[৪]; শুভ তিথি বার দেখিয়া লোকে মাঙ্গলিক কার্য্য করিত[৫]; কর্পূর-বাসিত তাম্বুল চর্ব্বণ করিত[৬]; দুগ্ধ তপ্ত করিয়া খাইত[৭]; রমণীরা মাথায় লোটন খোঁপা বাঁধিত[৮]; 'করতাল' নামক বাদ্য-যন্ত্রের প্রচলন ছিল[৯]; শিশুর জন্মের পাঁচ দিনে 'পাঁচটি', ছয় দিনে 'ষষ্ঠীপূজা', আট দিনে অষ্ট কলাই, ছয় মাসে 'অন্নপ্রাশন', পঞ্চ বর্ষে হাতে খড়ি দিবার প্রথা ছিল এবং ষষ্ঠীপূজার রাত্রিতে জাগরণ করিতে হইত[১০]; বিবাহের পূর্ব্বে 'অধিবাস' হইত; উপরে আম্র-পল্লব ও নীচে দূর্ব্বাধান দিয়া ঘট সংস্থাপন করা হইত; নান্দীমুখ শ্রাদ্ধান্তে গাত্রহরিদ্রা করান হইত; কন্যার গাত্রে পিঠালী লেপিয়া দিত এবং তোলা জলে স্নান করাইত[১১]।

১। "ললাটে তিলক যেহ্ন নব শশিকলা" (ঐ পৃঃ ৬৮) "সব সলি লাগে মোর কানের কুণ্ডল" (ঐ পৃঃ ৭৮)
"পায়ের মগর খাড়ু মাথে ঘোড়া চুলে (ঐ পৃঃ ৭৯)। ছোট ছোট বালকের মগর খাড়ু পায়" (বিজয় পদ্মাপু)।
"কানের হীরাধর কড়ি" (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, পৃঃ ১১২)। হাথের বলয় নিলে আঅর বাহুঠী। (ঐ পৃঃ ১৩৪)
"কনক কঙ্কন নিলে আঅর আঙ্গঠী। বড় দুঃখ পাইল আহ্মে কাড়িতে পাসলী।—ঐ।

২। "খাট পালঙ্কি গঢ়ায়িবোঁ" (ঐ পৃঃ ৩০০)

৩। আম্বল ব্যঞ্জনে মো বেশোয়ার দিলোঁ, সাকে দিলোঁ কানাসোআঁ পাণী।
ঘৃতে মো পরলা বুলিআঁ, ভাজিলোঁ এ কাঁচা গুআ।
ছোলঙ্গ চিপিআঁ নিম ঝোলে থেঁপিলো, বিধি জলে চড়াইলোঁ চাউল।" (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, পৃঃ ৩৩৬)

৪। হরিতালী চন্দ্র দেখিলোঁ ভাদ্র মাসে। হাত ভরিলো কিবা পূরিল কলসে।
ভূমিত আখর কিবা লিখিলোঁ জলে। মিছা দোষে বন্ধন আহ্মার তার ফলে। (ঐ পৃঃ ২৮৫)

৫। "শুভ তিথি বার শুভক্ষণে।" (ঐ পৃঃ ১৫)

৬। "কর্পূর বাসিত রাধা খাহ তাম্বুল।" (ঐ পৃঃ ১৪)

৭। "জুড়াইলে সোআদ লাগে তপত দুধ।" (ঐ)

৮। "লঙ্গ মালতীএঁ, খোঁপা ভরায়াঁ, ভিড়িয়া বাঁধে লোটনে।" (ঐ পৃঃ ১৩১)
"কুসুম সুষম মুকুতা মাল, লোটন ঘোটন বাঁধিয়া।"—(চণ্ডীদাস পদাবলী)

৯। "করে করতাল" ইত্যাদি (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন)।

১০। "পাঁচ দিনে পাঁচটি করিল সুপ্রবীণ।
ছয় দিনে ষষ্ঠী পূজা নিশি জাগরণে। দিলা অষ্ট কলাই অষ্টাহে শিশুগণে।
ছয় মাস বয়স্ক হইলে চারি জন। করাইল সবাকার ওদনপ্রাশন।
... ... পঞ্চবর্ষ গত হয় হাতে দিল খড়ী।"—(কৃত্তিবাসী রামায়ণ)।

১১। আনন্দিত হইলেন অজের নন্দন। আয়োজন করিলেন সর্ব্ব আভরণ।
ভারে ভারে দধি দুগ্ধ ভারে ভারে কলা। ভারে ভারে ক্ষীর ঘৃত শর্করা উজ্জ্বলা।

বিবাহে চতুর্দ্দোল ব্যবহার হইত১ ; বাদ্যকরেরা দামামা, দগড়, ঢাক, ঢোল, ডম্ফ, বীণা, সানাই, কাঁসি, বাঁশী প্রভৃতি বিয়াল্লিশ প্রকার বাজনা বাজাইত২ ; ছায়ামণ্ডপের নিম্নে বরকে বসান হইত৩ ; বসন ও চন্দন দিয়া বরকে বরণ করা হইত৪ ; স্ত্রীগণ বরকে বরণ করিত ও বাসর-ঘরে ঠাট্টা-তামাসা করিত৫ ; পায়ে দধি ও মাথায় দূর্ব্বাধান ছড়াইয়া দিয়া বরণ করিত৬ ; বিবাহকালে উভয় পক্ষের কুলজী পাঠের ব্যবস্থা ছিল৭ ; কন্যার মস্তক আমলকী দ্বারা পরিষ্কার করা হইত ও কেশ চিরুণী দ্বারা আঁচড়ান হইত৮ ; সধবার কপালে তিলক ও সিন্দূর দিবার প্রথা ছিল৯ ; তাহারা নাকে বেসর, গলায় হার, উপর-হাতে তাড়, কর্ণে কর্ণফুল, বাহুতে শঙ্খ ও শঙ্খের উপর কঙ্কণ, পায়ে নূপুর, বুকে কাঁচলী এবং পরিধানে 'পাটের পাছড়া' ব্যবহার করিত১০ ; 'গঙ্গাজলি

সন্দেশের ভার লয়ে গেল ভারিগণ। অধিবাস করিবারে চলেন ব্রাহ্মণ।"—(কৃত্তিবাসী রামায়ণ)
"ঘট সংস্থাপন করে যেমন বিধান। উপরেতে আম্রশাখা নীচে দূর্ব্বাধান।"—ঐ
"নান্দিমুখ করিলেন যেমন বিধান।"—ঐ
হরিদ্রা মাথায় চারি বয়ে কুতূহলে। অঙ্গেতে পিঠালী দিল সখীরা সকলে।"—(ঐ)
"তোলা জলে স্নান করাইল চারি বয়ে।"—(ঐ)

১। "চতুর্দ্দোল সাজাইল হেন আর নাই।"—ঐ।

২। দামামা দগড় বাজে বিয়াল্লিশ বাজনা।
ঢাক ঢোল বাজিতেছে ডম্ফ কোটি কোটি। চারি দিকে উঠিল বীণার ছটছটি।।
কত ঠাঁই বাজাইছে জোড়া জোড়া শানি। কাসি বাঁশি কত বাজে নিয়ম না জানি।—(ঐ)

৩। "চারি ভাই বৈসে ছায়ামণ্ডপের তলে। প্রণাম করেন সবে ব্রাহ্মণ সকলে।।" (কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ)

৪। বরণ করিল রামে বসন চন্দনে।" (ঐ)

৫। "নারীগণ করিলেক বরণ বিধান।" (ঐ)
"পরিহাস করে সবে রামের সহিত। তুমি হে জানকীপতি এ নহে উচিত।
এই কথা রাম হে তোমাকে কহি ভাল। সীতা বড় সুন্দরী তুমি হে বড় কাল।" ইত্যাদি। ঐ

৬। "পায়ে দধি দিলেন মাথায় দূর্ব্বাধান। বরণ করিয়া গেল যত সখীগণ।" (ঐ)

৭। বশিষ্ঠ বলেন মুনি হবে বোঝাবুঝি। কহ দেখি তুমি চন্দ্রবংশের কুলজি।। ইত্যাদি (ঐ)

৮। "সখী দেয় সীতার মস্তকে আমলকী।" (ঐ)
"চিরুণীতে কেশ আঁচড়াইয়া সখীগণ।" (ঐ)

৯। "কপালে তিলক আর নির্ম্মল সিন্দূর" (ঐ)

১০। "নাকেতে বেসর দিল মুক্তা সহকারে। পাটের পাছড়া দিল সকল শরীরে।
গলায় তাহার দিল হার ঝিলমিলি। বুকে পরাইয়া দিল সোনার কাঁচলি।।
উপর হাতেতে দিল তাড় স্বর্ণময়। সুবর্ণের কর্ণফুলে শোভে কর্ণদ্বয়।
দুই বাহু শঙ্খেতে শোভিল বিলক্ষণ। শঙ্খের উপর সাজে সোনার কঙ্কণ।
দুই পায়ে দিল তার বাজন নূপুর।—(কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ)

চামর' নামক এক প্রকার চামর ব্যজনার্থ ব্যবহৃত হইত[১]; পাত্রীকে আসনে বসাইয়া বিবাহমণ্ডপে আনা হইত, এবং পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সাত বার বরকে প্রদক্ষিণ করান হইত, তারপর মুখদর্শন হইত[২]; পঞ্চ হরীতকী দিয়া কন্যাদান হইত[৩]; অন্ন ও পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়া বরভোজন করান হইত[৪]; আহারের শেষে দধি, দুগ্ধ, পায়স ও নানা প্রকার মিষ্টান্ন পরিবেষণ করা হইত[৫]; কর্পূর ও তাম্বূল দ্বারা ভোজনান্তে মুখশুদ্ধি করা হইত[৬]; ধনীরা স্নানের সময় "সুগন্ধি তৈল" মাখিত ও সর্ব্বাঙ্গে সুগন্ধি চন্দনের প্রলেপ দিত[৭]; পীড়ি, থালা, বাটি, ডাবর ও ঝারির প্রচলন ছিল[৮]। কীর্ত্তিবাসের রামায়ণে সর্ব্বপ্রথম শারদীয়া দুর্গাপূজার সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়[৯]। এই সময় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে 'ফুলিয়া' প্রভৃতি মেল-বন্ধন ছিল ও মুখুটি, গাঙ্গুলি প্রভৃতি উপাধির প্রচলন হইয়াছিল[১০]; ধার্ম্মিক গৃহস্থগণ 'ষড়্ উপবাস' করি[১১]; রাজদ্বারে সুবর্ণ-লাঠি হস্তে দ্বারী থাকিত[১২]; 'দেয়ালে কাঠী' দিয়া বেলার ঘটিকা স্থির করা হইত[১৩]; বিদ্বান্ কবিকে 'পাটের পাছড়া', 'পুষ্পমালা'

১। "গঙ্গাজলি চামর দিলেক ঠাঁই ঠাঁই"। (কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ।)

২। "সুবর্ণের আসনে বসিলেন রূপবতী। * * * *
তখন মণ্ডপে গিয়া দিল দরশন ॥
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তবে নমস্কার করে। প্রদক্ষিণ সাতবার করিল রামেরে ॥
অতঃপর ঘুরাইল যত বন্ধুগণ ॥" (ঐ)

৩। পঞ্চ হরীতকী দিয়া পরিহার করে। (ঐ)

৪। "সুগন্ধ অন্ন সহ আর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।"

৫। "দধিদুগ্ধ দিল রাজা ভোজনাবশেষে।
ঘৃত দধি দুগ্ধ মধু মধুর পায়স। নানাবিধ মিষ্টান্ন খাইল নানা রস ॥" (ঐ)

৬। "কর্পূর তাম্বুলে করে মুখের শোধন।" (ঐ)

৭। "মাখিয়া সুগন্ধি তৈল স্নান করিবারে।" "সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া দিল সুগন্ধি চন্দন।" (কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ)

৮। "স্বর্ণপীঠ স্বর্ণথাল স্বর্ণময় বাটী। স্বর্ণের ডাবর আর স্বর্ণময় ঝারি। (ঐ)

৯। "অকালে বোধন করি পূজ দেবী মহেশ্বরী তরিবে হে এ দুঃখপাথার ॥
শ্রীরাম আপনি কয় বসন্ত শুদ্ধি সময় শরৎ অকাল এ পূজার ॥
……বিধাতা কহেন সার শুন বিধি দেই তার কর ষষ্ঠী কল্লেতে বোধন। ইত্যাদি (ঐ)

১০। কার নাম ফুলিয়ার মুখটি কীর্ত্তিবাস। রাজার আদেশ হইল করহ সম্ভাষ। (ঐ, আত্মবিবরণ)
"প্রথম বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলি।" (ঐ)

১১। ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে ষড় উপবাস।" (ঐ)

১২। শাত্র ধাই আইল দ্বারি হাতে সুবর্ণ লাঠি। (ঐ)

১৩। সপ্তঘটি বেলা যখন দেয়ালে পড়ে কাঠি। (ঐ)

ও 'চন্দনের ছড়া' দিয়া সম্মানিত করা হইত[১]; রাজারা পাত্র-পরিবেষ্টিত রাজসভায় উপবেশন করিত,[২] তথায় নাট্য গীত হইত ও আঙ্গিনায় রাঙ্গা মাছুরির উপর নেতের পাছুড়ী বিছাইয়া বিছানা করা হইত এবং উপরে পাটের চাঁদোয়া খাটান হইত[৩]। হাঁচি, টিকটিকির পতন, উঁচট খাওয়া, শূন্য কলসী দর্শন, ডাহিনে শিয়াল ও বামে সর্প দর্শন, পথে শুকুনি, যোগিনী, তেলী দর্শন, শুখান ডালে বসিয়া কাক শব্দ করিলে তাহা অশুভ লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইত[৪]। বিজয় গুপ্ত প্রভৃতির রচনা হইতে আরও জানা যায় যে, সধবা স্ত্রীলোকেরা কিংকিণী নামক একপ্রকার অলঙ্কার, দুই হাতে শঙ্খ, গলায় সুতলি, বক্ষে কাঁচুলি; সিথিতে সিন্দূর, ভ্রূতে কাজল, কর্ণে চাকি, পায়ে পাশুলী ব্যবহার করিত[৫]; ব্রাহ্মণগণ 'চারি বেদধারী', বৈদ্যজাতি শাস্ত্রেতে কুশল, কায়স্থ জাতি লেখক ছিল এবং অন্যান্য জাতি নিজ নিজ শাস্ত্রে চতুর ছিল[৬]; ...দান করা পুণ্য কার্য্য ছিল; এয়োরা মঙ্গল গাইতে আসিয়া পান, গুয়া, তৈল, সিন্দূর পাইত[৭] ও সধবারা পায়ে আলতা পরিত[৮]।

১। খুসি হৈয়া মহারাজ দিলা পুষ্পমাল।...
কেদার খাঁ শিরে চালে চন্দনের ছড়া। রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া। (ঐ)

২। পাত্র মিত্র সহ রাজা পরিহাসে মন। (ঐ)

৩। চারিদিকে নাট গীত সর্ব্বলোকে হাসে। চারিদিকে ধাওয়া ধাই রাজার আওাসে।
আঙ্গিনায় পড়িয়াছে রাঙ্গা মাজুরি। তার উপর পড়িয়াছে নেতের পাছুড়ি।
পাটের চাঁদোয়া শোভে মাথার উপর। মাঘমাসে খরা পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর। (ঐ)

৪। বামে সর্প দেখিলেন শৃগাল দক্ষিণে। তোলা পাড়া শ্রীরাম করেন কত মনে। (কীর্ত্তিবাস রামায়ণ)
কোণ অশুভ খণে পাঅ বাঢ়ায়িলোঁ। হাঁচী জিঠী আর উঝঁট না মানিলোঁ।
শুন কলসী লই সখি আগে জাএ। বাঅর শিআল মোর ডাহিনে জাএ।
কথো দুর পথে যোঁ দেখিলোঁ সগুনী। হাথে খাপর ভিখ মাঙ্গএ যোগিনী।
কাখে কুম্ভা লআঁ তেলী আগে জাএ। সুখান ডালত বসি কাক কাঢ়ে রাএ। (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, পৃঃ ৩১৮)

৫। দুই হাতের 'শঙ্খ' হইল গরল সঙ্খিনী। কেশের জাত কৈল এ কাল নাগিনী।
সুতলিয়া নাগে কৈল গলার সুতলী। দেবী বিচিত্র নাগে কৈল হৃদয়ে কাঁচুলি।।
সিন্দুরিয়া নাগে কৈল সিঁথ্যের সিন্দুর। কাজলিয়া কৈল দেবীর কাজল প্রচুর॥
পদ্মনাগে কৈল দেবীর সুন্দর কিংকিনী। চেতনাগে দিয়া কৈলা কাকালী কাঁচুলী॥
কনক নাগে কৈল কর্ণের চাকি বলি। বিষাতিয়া নাগে দেবীর পায়ের পাশুলি॥ (বিজয় গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ)

৬। চারিবেদধারী তথা ব্রাহ্মণ সকল। বৈদ্যজাতি বৈসে তথা শাস্ত্রেতে কুশল।
কায়স্থজাতি বৈসে তথা লিখিতে প্রচুর। আর যত জাতি নিজ শাস্ত্রেতে চতুর। (ঐ)

৭। জামাই এনেছি পুণ্যবান কন্যা করিব দান। (ঐ)
এয়ো এসে মঙ্গল গাইতে তারা সবে পান খাইতে
আর চাইবে তৈল সিন্দুরে। (ঐ)

৮। পায়ের আলতা তোর না পড়িল ধূলি। (ক্ষেমানন্দ)

চিরুণীদাঁতী স্ত্রীলোক বিধবা হইবার লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া সে কালেও বিবেচিত হইত[১]; অল্প বয়সে বিধবা হইলে তাহাকে সকলের গঞ্জনা ভোগ করিতে হইত[২]; বিধবার পত্যন্তর গ্রহণের প্রথা ছিল না[৩]; খনি, পাটের শাড়ী, সুবর্ণের চুড়ি ব্যবহৃত হইত এবং সিঁথিতে সিন্দুরের বদলে অনেক স্থলে মুসলমানের মধ্যে 'ফাউগের গুঁড়ি' ধারণ করিবার প্রথা ছিল[৪]; পুরুষের পক্ষে 'দীর্ঘ চুল' ধারণ করার প্রথা ছিল[৫]; বাঙ্গালীরা একখানা কাপড় কাছা দিয়া পরিত, একখানি মাথায় বাঁধিত ও একখানা গায়ে দিত[৬]। এই সময় বাঙ্গালীরা ডিঙ্গা সাজাইয়া সমুদ্রে যাতায়াত করিত—ডিঙ্গাগুলির মধ্যে বাণিজ্যের উপযোগী নানা প্রকার দ্রব্য থাকিত ও কোনও কোনও ডিঙ্গার উপর হাট লাগিত[৭]। এই সময় হিন্দুর প্রতি পাঠান রাজগণের ব্যবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার একটি নমুনা বিজয় গুপ্তের নিম্নলিখিত রচনায় প্রাপ্ত হওয়া যায়; যথা,—

"ব্রাহ্মণ পাইলে লাগে পরম কৌতুকে।
কার পৈতা ছিঁড়ি ফেলে থুথু দেয় মুখে॥"—(বিজয় গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ)

এই কালে কৃষকেরা যেরূপ ভাবে আবাদ করিত, তাহার একটি চিত্র রামেশ্বরের নিম্নলিখিত কবিতায় পাওয়া যায়। যথা,—

" ক্ষেতে বসি কৃষাণে ঈষান বলে ভাল।
চারি দণ্ডে চৌদিক চৌরস করে চাল॥
আড়ি তুলে ধারে ধারে ধরাইল ধান।
হাটু গাড়ি ঈশানেতে আরম্ভে নিড়ান॥
বারটি বারঠে চেকুড়ার মড়া উড়ি।
ওলামুখি পাতি মারে পুতে যায় মুড়ি॥
দল দুর্ব্বা সোলা শ্যামা ত্রিশিরা কেশুর।
গড় গড় নানা খড় উপাড়ে প্রচুর॥

১। খণ্ডকপালিনী বেহলা চিরুণীদাঁতী। বিবাহ দিনে খাইলি পতি না পোহাতে রাতি। (ক্ষেমানন্দ)

২। ঐ।

৩। বালিকা যুবতী বৃদ্ধা যার পতি মরে ; বিধবা হইয়া সেই থাকে নিজ ঘরে। (কেতকাদাস)

৪। খনি বদলে দিব কাঁচা পাটের শাড়ী।
শঙ্খ বদলে দিব সুবর্ণের চুড়ি। সিন্দুর বদলে দিব ফাউগের গুড়ি। (বিজয় গুপ্ত)

৫। পরম সুন্দর লখাইর দীর্ঘ মাথার চুল। (বিজয় গুপ্ত)

৬। একখান কাচিয়া পিন্ধে, আর একখান মাথায় বাঁধে, আর একখান দিল সর্ব্বগায়। (বিজয় গুপ্ত)

৭। তার পিছে চলে ডিঙ্গা নাম চন্দ্রপাট।
যাহার উপরে চাঁদ মিলায়েছে হাট। (বিজয় গুপ্ত)

খর খর খুজিয়া খড়ের ভাঙ্গে বাড় ।
কুলি করি খাইল ধান্যের ধার ঝাড় ।।
কিতা যুড়ে ভিতা বেড়ে মাঝে গিয়া রয় ।
উলট পালট করে বার পাঁচ ছয় ॥
এইরূপে সেই কিতা সারে চট পট ।
কিতা নিড়াইয়া ভীম চলে সট সট ॥—(রামেশ্বরের 'শিবের ছড়া')

৬। শ্রীচৈতন্য-সাহিত্যে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবনের প্রসঙ্গ। ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ঘটে। তাঁহার জীবনকাহিনী ও ধর্ম্মভাব লইয়া বহু কাব্য ও পদাবলী বিরচিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থকে আমরা 'শ্রীচৈতন্য-সাহিত্য' নামে অভিহিত করিতেছি। শ্রীচৈতন্য-সাহিত্যের মধ্যে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। বৃন্দাবনদাস ১৪২৯ শকে (১৫০৭খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন ও ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার তিরোভাব হয়। ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি চৈতন্যভাগবত রচনা শেষ করেন। কৃষ্ণদাস ১৬১৫খৃষ্টাব্দে চৈতন্য-চরিতামৃত রচনা শেষ করেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলও প্রায় ঐরূপ সময়ে বিরচিত হয়। সম্ভবতঃ ঐ সময়ের মধ্যে কাশীরাম দাস 'মহাভারত'[1] ও অদ্ভুতাচার্য্য অদ্ভুত রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত মহাভারত ও অদ্ভুত রামায়ণে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন ও সামাজিক প্রসঙ্গ বিশেষ কিছুই পরিদৃষ্ট হয় না। আমরা শ্রীচৈতন্য-সাহিত্য পাঠে জানিতে পারি, এই সময় মুসলমানগণ বহু হিন্দুকে বলপুর্ব্বক মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেছিল। নবদ্বীপের সন্নিহিত পিরালী গ্রামের অনেক হিন্দুকে বাধ্য হইয়া মুসলমান হইতে হইয়াছিল[2]। এইরূপে যখন বহু লোককে বলপুর্ব্বক মুসলমান করা হইতেছিল, তখন হিন্দুরা বাধ্য হইয়া অল্প প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া, তাহাদিগকে সমাজে লইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন[3]। জয়ানন্দের গ্রন্থে 'ধনুর্ম্ময়' প্রজার উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, এই সময় প্রজারা অত্যাচারের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য ধনুক ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই সময় লোক অত্যন্ত বিসয়াশক্ত

১। ১৫২৬ শক বা ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে কাশীরামদাস মহাভারতের বিরাট পর্ব্ব রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

২। পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন। উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ ॥
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কাঁধে। ঘর দ্বার লোটে আর লৌহপাশে বাঁধে। (জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল)
যবন তাড়নে যার রহিল ব্রহ্মতজ (চৈঃ চরিতামৃত, আদি)

৩। বল করি জাতি যদি লএত যবনে। ছয় গ্রাস অন্ন যদি করায় ভক্ষণে।
প্রায়শ্চিত্ত করিলে জাতি পায় সেই জন। ছয় পুরুষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মতেজ নাহি ছাড়ে।
ব্রহ্মতেজ নাহি থাকে গোমাংস ভক্ষণে। (অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ)

ও কৃষ্ণভক্তিশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল[১]; রাত্রি জাগরণ করিয়া মঙ্গলচণ্ডীর গীত শুনিত; বিষহরির পূজা করিত; বহু ধন ব্যয় করিয়া পুত্তল পূজা করিত; পুত্র-কন্যার বিবাহে বহু ধন নষ্ট করিত[২] কেহ কেহ বাশুলীর পূজা করিত ও মদ্য মাংস দিয়া যক্ষ পূজা করিত এবং সর্ব্বদা নৃত্য-গীত-বাদ্যে মত্ত থাকিত[৩]; যোগীপাল, মহীপাল ও গোপীপালের গীত শুনিয়া লোকেরা আহ্লাদিত হইত[৪]। মহাপ্রভুর প্রচারের ফলে এই সময় জাতিভেদের কঠোরতা কমিয়া গিয়াছিল[৫]। এই সময় সন্তানের জন্মে 'জাতকর্ম্ম' করিত এবং তদুপলক্ষে বন্ধু-বান্ধবেরা নানা প্রকার যৌতুক দিত ও দূর্ব্বাধান্য শিরে নিক্ষেপ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিত[৬]; ব্রাহ্মণ-রমণীগণকে সিন্দূর, হরিদ্রা, তৈল, দধি, কলা, নারিকেল দিয়া অভ্যর্থনা করা হইত[৭]; নৃত্য, গীত, বাদ্য ও সংকীর্ত্তন হইত[৮]; নর্ত্তক, গায়ক, ভাট ও বাদকেরা পুরস্কার পাইত[৯]; সুবর্ণের কৌড়ি, বৌলি, রজতমুদ্রা, পাশুলী, অঙ্গদ, কঙ্কণ, শঙ্খ, রজতমল, বাঁক, নানা প্রকার হার, হেমজড়িত ব্যাঘ্রনখ, কটিদেশের ডোরি, পট্টশাড়ী, পট্ট পাড়িদার ভূনীফোতা, দূর্ব্বাধান্য, গোরোচনা, হরিদ্রা, কুঙ্কুম, চন্দন উপহার দিয়া জাত বালককে আশীর্ব্বাদ করিবার প্রথা ছিল। সম্ভ্রান্ত রমণীগণ বস্ত্রাচ্ছাদিত ডুলিতে চড়িয়া নিজ বাটী হইতে অন্য বাড়ীতে যাতায়াত করিত; পেটারীতে বস্ত্রালঙ্কার রাখিত[১০]।

১। রমা দৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বসে। ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে॥
কৃষ্ণনামভক্তিশূন্য সকল সংসার। (চৈতন্যভাগবত)

২। মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।*
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন। পুত্তলী করয় কেহ দিয়া বহু ধন॥
ধন নষ্ট করে কন্যা পুত্রের বিভায়ে। (চৈতন্য ভাগবত)

৩। বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে। মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥
নিরবধি নৃত্য গীত বাদ্য কোলাহলে। না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গলে॥ (ঐ)

৪। যোগীপাল গোপীপাল মহীপাল গীত। ইহা শুনিতে যে লোক আনন্দিত॥ (ঐ)

৫। প্রভু বলে যে জন তোমার অন্ন খায়। কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণ সেই পায় সর্ব্বথায়॥ (চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড)
মুচি যদি ভক্তি সহ ডাকে কৃষ্ণধনে। কোটি নমস্কার করি তাহার চরণে॥ (গোবিন্দদাসের কড়চা)

৬। করাইল জাতকর্ম্ম যে আছিল বিধিকর্ম্ম তবে মিশ্র করে নানা দান।
যৌতুক পাইল যত ঘরে বা আছিল কত সব ধন বিপ্রে দিল দান।
দূর্ব্বা ধান্য দিল শীর্ষে কৈল বহু আশীষে চিরজীবী হও দুই ভাই। (চৈঃ চরিতামৃত, আদিলীলা)

৭। সিন্দুর হরিদ্রা তৈল, দধি কলা নারিকেল দিয়া পূজে নারীগণ রঙ্গে॥ (ঐ)

৮। নর্ত্তক বাদক ভাট নবদ্বীপে যার নাট সবে আসি নাচে পাঞা প্রীত॥ (ঐ)

৯। যত নর্ত্তক গায়ন, ভাট অকিঞ্চন জন ধন দিয়া কৈল সবার মান॥ (ঐ)

১০। অদ্বৈত আচার্য্য ভার্য্যা জগৎ-পূজিতা আর্য্যা নাম তাঁর সীতা ঠাকুরাণী।
আচার্য্যের আজ্ঞা পাঞা গেলা উপহার লৈঞা দেখিতে বালক-শিরোমণি॥

জল ও গোময় দিয়া গৃহের মেজে লেপিত[১]; জ্যোতিষিক গণনাদ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা হইত[২]; শুভ দিন দেখিয়া বালকের 'নামকরণ' করা হইত[৩]; লোকে গঙ্গাস্নান করিয়া নৈবেদ্য, চাউল, কলা, সন্দেশ, চন্দন ও পুষ্প দ্বারা দেবপূজা করিত[৪]; পিতা মাতার সেবা গৃহস্থের অবশ্যকরণীয় ছিল[৫]; বংশে কেহ সন্ন্যাস অবলম্বন করিলে, সে পিতৃমাতৃ উভয় কুলের পাবন বলিয়া পরিগণিত হইত[৬]; বোধ হয়, সকল ব্রাহ্মণ-বিধবা একাদশী করিত না[৭]; টোলে ও পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা হইত[৮]; বৌদ্ধেরা বোধ হয়, এই সময় 'পাষণ্ডী' সংজ্ঞায় অভিহিত হইত[৯]; ভবানীপূজকেরা ওড্রফুল, হরিদ্রা, সিন্দূর, রক্তচন্দন, তণ্ডুল ও মদ্য দ্বারা দেবীর পূজা করিত[১০]; এই সময় কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় বলিয়াই পরিচিত ছিল

সুবর্ণের কড়ি বৌলি রজত মুদ্রা পাশুলি সুবর্ণের অঙ্গদ কঙ্কণ।
দু বাহুতে দিব্য শঙ্খ রজতের মল বঙ্ক স্বর্ণমুদ্রা নানা হারগণ॥
ব্যাঘ্রনখ হেম-জড়ি কটি পট্টসূত্রডোরী হস্তপদের যত আভরণ।
চিত্রবর্ণ পট্ট শাড়ী ভুনীপোতা পট্ট পাড়ি স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা বহু ধন॥
দূর্ব্বাধান্য গোরোচন হরিদ্রা কুঙ্কুম চন্দন, মঙ্গল দ্রব্য পাত্রেতে ভরিয়া।
বস্ত্রগুপ্ত দোলা চড়ি সঙ্গে লয়া দাস চেড়ী বস্ত্রালঙ্কার পেটারি ভরিয়া॥
ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার সঙ্গে লৈল বহু ভার শচীগৃহে হৈলা উপনীত। (চৈঃ চরিতামৃত, আদিলীলা)

১। জল গোময় দিয়া সেই স্থান লেপাইল। (ঐ)
ব্রাহ্মণ সজ্জন তথা বৈসে অতিশয়। ঘরেতে গোময় না দেয় দুর্জ্জনের ভয়॥ (জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল)

২। লগ্ন গণি হর্ষমতি নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে।
মহাপুরুষের চিহ্ন লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন দেখি এই তারিবে সংসারে॥ (চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা)

৩। মহোৎসব কর সবে বোলাহ ব্রাহ্মণ। আজি দিন ভাল করিব নামকরণ॥ (চৈঃ চরিতামৃত)

৪। "গঙ্গাস্নান করি পূজা করিতে লাগিল।
আপনি চন্দন পরি পরেন ফুলমালা। নৈবেদ্য কাড়িয়া খান সন্দেশ চালু কলা॥ (ঐ)

৫। "গৃহস্থ হইয়া করিব পিতা মাতার সেবন। ইহাতেই তুষ্ট হবেন লক্ষ্মী নারায়ণ॥" (ঐ)

৬। "ভাল হইল বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল। পিতৃকুল মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল॥" (ঐ)

৭। "প্রভু কহে একাদশীতে অন্ন না খাইবা॥"
শচী কহে না খাইব ভালই কহিলা। সেই হইতে একাদশী করিতে লাগিলা॥" (ঐ)

৮। "শত শত পড়ুয়া আসি লাগিল পড়িতে" (চৈ চরিতামৃত, আদিলীলা)।

৯। একদিন বিপ্র নাম গোপাল চাপাল। পাষণ্ডীপ্রধান সেই দুর্ম্মুখ বাচাল॥" (ঐ)
"পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার। পাষণ্ডী সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার॥" (ঐ)

১০। "ভবানী পূজার সব সামগ্রী লইয়া। রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপিয়া॥
কলার পাত উপরে থুইল ওড্রফুল। হরিদ্রা সিন্দুর রক্তচন্দন তণ্ডুল॥
মদ্যভাণ্ড পাশে ধরি নিজ ঘরে। (ঐ)

এবং 'কায়স্থ-বুদ্ধি'কে সকলে ভয় করিয়া চলিত[১]; রুটির প্রচলন ছিল[২]; পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত দ্বারা শুদ্ধি হইত[৩]; "ভোটকম্বল' নামক একপ্রকার মহার্ঘ কম্বলের ব্যবহার ছিল[৪]; নিরামিষ রন্ধনের বিশেষ পারিপাট্য ছিল এবং সদাচারী ব্যক্তিগণ শ্রীবিষ্ণু ও শালগ্রামকে নিবেদন করিয়া আহার করিতেন; ধাতুপাত্রে অথবা আঁঠিয়া কলার পাতে আহার করিবার প্রথা ছিল; ঘৃতসিক্ত শাল্যন্ন, মুদ্গস্থপ, বিবিধ প্রকার বাস্তক-শাক, পটোল ভাজা, কুষ্মাণ্ডবড়ি, মানকচু, চৈ মরিচ ও সুক্তা দিয়া পঞ্চবিধ তিক্ত ও ঝাল, কোমল নিম্বপত্র সহ বার্ত্তাকীভাজা, ফুলবড়ি ভাজা, কুষ্মাণ্ড ও মানচাকি ভাজা, মোচাঘণ্ট, দুগ্ধ-কুষ্মাণ্ড, মধুরাম্ল, বড়া অম্ল প্রভৃতি পঞ্চ প্রকার অম্ল, মুগবড়া, আমবড়া, কলার বড়া, ক্ষীরপুলি, নারিকেলপুলি প্রভৃতি পিষ্টক, সঘৃত পায়স, ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ, চগ্ধচিড়া, কলা, দুগ্ধ লকলকী (অর্থাৎ অলাবু সহ দুগ্ধের পাকবিশেষ), চাঁপাকলা, দধি, সন্দেশ, দুড়ুম, ক্ষীর, কাশন্দি, আচার, সুকুতার ঝোল, মরিচের ঝোল, ছেনাবড়া, বড়ীঝোল, দুগ্ধ-তুম্বি, দুগ্ধকুষ্মাণ্ড, মোচাভাজা, বেসারি, লাফরা, বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ড বড়ীর ব্যঞ্জন প্রভৃতি নানা প্রকার ভোজ্য দ্রব্যের উল্লেখ পাওয়া যায়[৫]। এই সময়

১। "কেশব ছত্রীরে রাজা বার্ত্তা যে পুছিল। প্রভুর মহিমা ছত্রী উড়াইয়া দিল॥" (চৈ, চঃ)
এখানে কেশব বসুকে কেশব 'ছত্রী' বলা হইয়াছে।
বিশেষ কায়স্থ বুদ্ধে অন্তরে করে ডর। (চৈঃ চঃ, অন্ত্যলীলা)

২। "জন পাঁচ সাত রুটি করে রাশি রাশি।" (ঐ)

৩। "পঞ্চগব্য পঞ্চামৃতে করাইল স্নান।" (ঐ)

৪। "ভোট কম্বল পানে প্রভু চাহে বারবার।" (ঐ)

৫। "প্রথমেই পাক করিয়াছেন আচার্য্যাণী। বিষ্ণুসমর্পণ কৈল আচার্য্য আপনি॥
তিন ঠাঁই ভোগ বাড়াইল সম করি। কৃষ্ণের ভোগ বাড়াইল ধাতুপাত্রোপরি॥
বত্রিশা আটিয়া কলার আঙটিয়া পাতে। দুই ঠাঁই ভোগ বাড়াইল ভালমতে॥
মধ্যে পীত ঘৃতসিক্ত শাল্যন্নের স্তূপ। চারিদিকে ব্যঞ্জন চোঙ্গা আর মুদ্গস্থপ॥
বাস্তক শাক পাক বিবিধ প্রকার। পটোল কুষ্মাণ্ড বড়ি মানকচু আর॥
চৈ মরিচ সুক্তা দিয়া সব ফল মূলে। অমৃতনিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে॥
কোমল নিম্ব পত্রসহ ভাজা বার্ত্তিকী। ফুলবড়ি ভাজা আর কুষ্মাণ্ড মানচাকি॥
নারিকেল শস্ত ছানা শর্করা মধুর। মোচা ঘণ্ট, দুগ্ধকুষ্মাণ্ড সকল প্রচুর॥
মধুরাম্ল, বড়া অম্ল অম্ল পাঁচ ছয়। সকল ব্যঞ্জন কৈল লোকে যত হয়॥
মুদ্গবড়া, মাষবড়া কলার বড়া মিষ্ট। ক্ষীর পুলি, নারিকেল পুলি, যত পিঠা ইষ্ট॥
সঘৃত পায়স মৃৎকুণ্ডিকা ভরিয়া। তিন পাত্রে ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ রাখেত ধরিয়া॥
দুগ্ধ, চিড়া কলা আর দুগ্ধলকলকী। ... ...
চাঁপা কলা দধি সন্দেশ কহিতে না পারি। অন্ন ব্যঞ্জন উপর তুলসীমঞ্জরী॥" (চৈঃ চঃ, মধ্য, ৩য়)
"এক দিন শাল্যন্ন ব্যঞ্জন পাঁচ সাত। শাক মোচা ঘণ্ট ভ্রষ্ট পটোল নিম্বপাত॥
লেম্বু আদাখণ্ড দধি দুগ্ধ খণ্ড সার। শালগ্রামে সমর্পিলেন বহু উপহার॥ (ঐ, মধ্যলীলা, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ)

ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত কদাচারী হইয়া পড়িয়াছিল[১]; পীঁড়ির উপর বসিয়া ভোজন করিত[২]; রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র-শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে, মধ্যে মধ্যে বিবাহ হইত[৩]।

৭। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবন ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের পরিচয়। ১৪৯৯ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কবিকঙ্কণ তাঁহার চণ্ডীকাব্য-রচনা শেষ করেন। এই কাব্যে তাৎকালিক বাঙ্গালী জাতির গৃহস্থালীর কথা, সমাজ-বিন্যাসের কথা, সামাজিক আচার-ব্যবহারের কথা, ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবনের কথা এরূপ সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে —পারিপার্শ্বিক জগতের চিত্র এরূপ নিখুঁত ভাবে এই কাব্যে অঙ্কিত হইয়াছে যে, ইহা পাঠ করিতে করিতে সত্য সত্যই আমাদিগকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া পড়িতে হয়। কবিকঙ্কণ চণ্ডী খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালী জাতির দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবনের একখানি অপূর্ব্ব আলেখ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই কাব্যখানি পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি যে, তখনকার বাঙ্গালী জাতির গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবন সুনিয়ন্ত্রিত ও ধর্ম্মপ্রবণ ছিল। বড় লোকদের বাড়ীতে বিষ্ণুমন্দির, শিবমন্দির, অনাথশালা ও অতিথিশালা স্থাপিত থাকিত[৪]; প্রবাসীদিগের ব্যবহারের জন্য 'দীঘল মন্দির' থাকিত[৫]; নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থগণ ইষ্টদেবের পূজা না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না[৬]; এ কালের ন্যায় সে কালেও ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য জাতি বাঙ্গালী হিন্দুসমাজের চূড়ামণি ছিল[৭]; তৎকালেও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে মুখুটি,

---

"এই মত চিঁড়া হুড়ুম সন্দেশ সকল। এই মত পিঠা পানা সতীর ওল।
কাশন্দি আচার আদি অনেক প্রকার॥" (ঐ)
"দশপ্রকার শাক নিম্ব সুকুতার ঝোল। মরিচের ঝোল, ছেনা বড়া বড়ী ঘোল॥
দুগ্ধতুলি, দুগ্ধ কুষ্মাণ্ড বেসারি লাফরা। মোচা ঘণ্ট মোচা ভাজা, বিবিধ শাকরা॥
বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ডের বড়ীর ব্যঞ্জন অপার। ফুলবড়ি ফলফুলে বিবিধ প্রকার॥
নবনিম্ব পত্রসহ ভ্রষ্ট বার্ত্তাকী। ফুলাড়ী পটোল ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী॥ ইত্যাদি (ঐ)

১। "ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ। ডাকা চুরি পরগৃহ দাহ সর্ব্বক্ষণ॥ (চৈ ভা, মধ্য, ১৩ অঃ)
[ইহার সহিত চণ্ডীদাসের এই উক্তি প্রণিধানযোগ্য—
"তুমি রজকিনী, আমার রমণী, তুমি হও মাতৃ পিতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন, তোমার ভজন, তুমি বেদমাতা গায়ত্রী॥"]

২। "অন্ন খাইবে পীঠে বসিতে কাঁহা অপরাধ?" (চৈ চঃ, মধ্যলীলা, ১৫ পরি)

৩। "রাঢ়ী ও বারেন্দ্রের বিয়ে হয়েছে অনেক। দেশভেদে নামভেদ এই পরত্তেক॥"
(নিত্যানন্দদাসের "প্রেমবিলাস", ১৯ বিলাস)

৪। "আওয়াসের পূর্ব্বদিশে, বিচিত্র কলস বৈসে, সারি সারি বিষ্ণুর দেউল।"
নগর চত্বর মাঝে, শিবের মণ্ডপ সাজে, অনাথমণ্ডপ অতিথিশালা॥ (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

৫। "বাসাড়ে জনের তরে, দীঘল মন্দির করে, প্রবাসী জনের তথি মেলা॥" (ঐ)

৬। "আশ্রম পুখরি আড়া, নৈবেদ্য শালুক পোড়া, পূজা কৈলু কুমুদ প্রসূনে।" (ঐ)

৭। "কুলে-শীলে নিরবদ্য, ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য, দামুন্তায় সজ্জনের বাস।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্যধৃত ক, ক,চ)

চাটুতি, বন্দ্য, কাঞ্জিলাল, ঘোষাল, গাঙ্গুলী, পুতিতুণ্ড, গুড় প্রভৃতি উপাধির প্রচলন ছিল; বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণকে 'গাঁই নাই গোত্র আছে' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; মূর্খ ব্রাহ্মণেরা নগরে যাজন করিত এবং চন্দন-তিলক পরিয়া ঘরে-ঘরে দেবপূজা ও শ্রাদ্ধ করিয়া বেড়াইত; ঘটক ব্রাহ্মণের অমর্য্যাদা করিলে তাহারা 'কুলপঞ্জী' বিচার করিয়া যদৃচ্ছা গালাগালি করিত; নগরের এক পাশে গ্রহবিপ্রগণ বাস করিত ও 'দীপিকা ভাস্বতি' ধরিয়া জাত বালকের ঠিকুজি কুষ্ঠী রচনা করিত; বর্ণদ্বিজগণ মঠপতি ছিল; সন্ন্যাসী ও কপালী গায়ে নানা তীর্থের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত; বৈষ্ণবেরা কাঁথা, কম্বল, লাঠী লইয়া, গলায় তুলসী-মালা পরিয়া, 'গীতনাটে' কালযাপন করিত[১]। গুপ্ত, সেন, দাস, দত্ত, কর প্রভৃতি উপাধি-ধারী বৈদ্যগণ প্রভাতে উঠিয়া, কপালে 'উর্দ্ধফোটা' কাটিয়া, শিরে বসন বাঁধিয়া, জর্জ্জর ধুতি

১। কুলে শীলে নহে নিন্দ্য, মুখটি চাটুতি বন্দ্য, কাঞ্জিলাল ঘোষাল গাঙ্গুলি।
পুতিতুণ্ড বৈসে গুড়, রাই গাঁই কেশরী হড়, ঘণ্টেশ্বরী বৈসে কুলকুলী॥
পারিহাই পীতমুণ্ডী, ঝিকরাড়ী মালখণ্ডী, ঘোষলী বড়াল কুলমাল।
ছোট চণ্ডী পলসাই দীর্ঘাড়ী কুসুম গাই সাঁই গাঁই কুলভি পড়্যাল॥
কুশরি কড়িয়াল পূষলী সিমলাল পিপলাই বৈসে পূর্ব্বগাঁই।
ধনে মানে অতি চণ্ড বাপুলি বিশাল মুণ্ড করাল নিবসে সিমলাই॥
পালধি হিজল গাঁই মাসচটক ডিঙ্গসাই কাঞ্জারী সাহরি ভূরিষ্ঠাল।
বটগ্রামী নন্দী গাঁই ভাটাতি সিদ্ধল দায়ী, নায়েবী কোয়ারী মতিলাল॥
গাঁই নাই গোত্র আছে বসিল বীরের কাছে, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সাত শত।
ব্যবহারে বড় ঋজু নিত্য পড়ে বেদ যজু বেদবিদ্যা পড়ে অবিরত॥
কোন দ্বিজ অধিষ্ঠাতা কোন দ্বিজ কহে কথা কেহ পড়ে ভারত পুরাণ।
... মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে নগরে যাজন করে শিখয়ে পূজার অধিষ্ঠান।
চন্দন তিলক পরে দেব পূজে ঘরে ঘরে চাউলের বোচকা বাঁধে টান॥
ময়রা ঘরে পায় খণ্ড, গোপঘরে দধিভাণ্ড তেলীঘরে তৈল কুপী ভরি।
কোথাও মাসরা কড়ি কেহ দেয় দালি বড়ি গ্রামযাজী আনন্দে সাঁতরি॥
... ... নাগরিয়া করে শ্রাদ্ধ গ্রামযাজী হয় অধিষ্ঠান।
সাঙ্গ করি দ্বিজে কয় কাহণ দক্ষিণা হয় হাতে কুশে দক্ষিণা ফুরাণ॥
গালি দিয়া লণ্ডে ভণ্ডে ঘটক ব্রাহ্মণ দণ্ডে কুলপাঁজী করিয়া বিচার।
যে নাহি গৌরব করে সভায় বিড়ম্বে তারে যাবৎ না পায় পুরস্কার॥
... ... এক পাশে গ্রহবিপ্রগণ বৈসে বর্ণ-দ্বিজগণ মঠপতি।
দীপিকা ভাস্বতি ধরে শাস্ত্র বিচার করে বালকের লেখে জাওয়াতি॥
মাথায় পিঙ্গল জটা সন্ন্যাসী কপালী ঘটা ঝুপড়ি বাঁধিয়া একপাশে।
গায়ে নানা তীর্থচীন্ ভিক্ষা করি অনুদিন একপাশে তারা সব বৈসে॥
সদা লয় হরিনাম ভূমি পাইয়া ইনাম বৈষ্ণব বসিল গুজরাটে।
কাঁথা কম্বল লাঠি গলায় তুলসী কাঠি সদাই গোঙ্গায় গীত নাটে॥ (ক• ক• চণ্ডী)

পরিয়া, কাঁধে পুথি লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত; তাহাদের পাশে 'অগ্রদানী' ব্রাহ্মণেরা প্রত্যহ রোগীর সন্ধান লইত[১]; কায়স্থগণ সকলেই লেখাপড়া জানিত; ইহারা মহাজন, ভব্য ও নগরের শোভাস্বরূপ ছিল, ভাল বাড়িতে বাস করিত এবং ভূসম্পত্তিশালী ছিল; মাহেশের ঘোষ কুলে শীলে দোষহীন ছিল; বসু মিত্র কুলের প্রধান ছিল; পাল, পালিত, নন্দী, সিংহ, সেন, দেব, দত্ত, দাস, কর, নাগ, সোম, চন্দ, ভঞ্জ, বিষ্ণু, রাহা, বিন্দ প্রভৃতি উপাধি কায়স্থ জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল[২]। বণিক্ ও গোপগণ শান্ত শিষ্ট ছিল ও কৃষি-কার্য্য করিত[৩]। তেলিরা কেহ চাষ করিত, কেহ তেল বেচিত, কেহ ঘানি পাড়িত[৪]। কামারেরা কোদালি প্রভৃতি লৌহাস্ত্র নির্ম্মাণ করিত[৫]। তাম্বুলী পানের বীড়া বিক্রয় করিত[৬]। কুম্ভকারেরা মৃত্তিকা দ্বারা হাঁড়ি, কুঁড়ি, মৃদঙ্গ, দগড়, কাড়া প্রভৃতি প্রস্তুত করিত[৭]। তন্তুবায় ভুনীধুতি ও খাদি বুনিত[৮]। মালীরা ফুলের মালা ও সাজি লইয়া ফিরিত[৯]। বারুই বরজ দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিত[১০]। নাপিত 'কক্ষতলে কাতি করিয়া', 'রসাল দর্পণ' করে লইয়া বেড়াইত[১১]। মোদকেরা চিনির কারখানা করিত ও খণ্ড নাড়ু প্রস্তুত

১। বৈদ্য জনের তত্ত্ব গুপ্ত সেন দাস দত্ত কর আদি বৈসে কুলস্থান।
বটিকায় কার যশ কেহ প্রয়োগের বশ নানা তন্ত্র কররে বাখান ॥
উঠিয়া প্রভাত কালে, উর্দ্ধফোটা করে ভালে বসন মণ্ডিত করি শিরে।
পরিয়া জর্জ্জর ধুতি কাঁধে করি নানা পুথি গুজরাটে বৈদ্যগণ ফিরে ॥
বৈদ্য জনের পাশে অগ্রদানী জন বৈসে নিত্য করে রোগীর সন্ধান।"—(ক ক চ)

২।...কায়স্থ আইল মহাজন।
প্রসন্ন সবার বাণী, লেখা পড়া সবে জানি, ভব্য জন নগরের শোভা।
... কুলে শীলে হীনদোষ কেহ মাহেশের ঘোষ বসুমিত্র কুলের প্রধান।
গুহ গুণে হয়্যা বন্দী পাল পালিত নন্দি সিংহ সেন দেব দত্ত দাস।
কর নাগ সোম চন্দ ভঞ্জ বিষ্ণু রাহা বিন্দ এক স্থানে করিব নিবাস ॥
... বিচার করিয়া তুমি দিবে ভাল বাড়ীভূমি শুনি বীর হৃদয় উল্লাস ॥ (ক ক চ)

৩। " নিবসে বণিক্ গোপ না জানে কপট কোপ ক্ষেতে উপাজয় নানা ধন। (ক ক চ)

৪। " তেলি বৈসে শতজনা কেহ চাষী কেহ ঘনা কিনিয়া বেচয়ে কেহ তেল। (ঐ)

৫। " কামার পাতিয়া শাল কোদালী কুঠারি ফাল, গড়ে টাঙ্গী আঙ্গারথী শেল। (ঐ)

৬। " লইয়া গুবাক পান বসিল তাম্বুলীজন মহাবীরে নিত্য দেই বীড়া। (ঐ)

৭। " কুম্ভকার গুজরাটে হাঁড়ি কুড়ি গড়ে পেটে মৃদঙ্গ দগড় কাড়া পড়া। (ঐ)

৮। " শত শত একজায় গুজরাটে তন্তুবায় ভুনী ধুতি খাদি বুনে গড়া। (ঐ)

৯। " মালী বৈসে গুজরাটে সদাই মালঞে খাটে মালা যোড় গড়ে ফুলঘর। (ঐ)

১০। " বারুই নিবসে পুরে বরজ নির্ম্মাণ করে মহাবীরে নিত্য দেই পান। (ঐ)

১১। " নাপিত নিবসে তথি কক্ষতলে করি কাতি করে ধরি রসাল দর্পণ। (ঐ)

করিত এবং শিরে পসরা লইয়া নগরে নগরে শিশুদিগের নিকট বিক্রয় করিত[১]। 'সরাকে'রা নিরামিষভোজী ছিল ও নেতবস্ত্র ও পাটশাড়ী বুনিত[২]। গন্ধবণিক্, শঙ্খবণিক্, মণিবণিক্, কংসবণিক্ বহু ছিল; কাংস্য-বণিকেরা ঝারি, খুরি, থাল, বাটী, খোরা, হাঁড়ি, দীপ, সাঁপুড়ি, চুনাতি, বাটা, ঘাঘর, ঘণ্টা, সিংহাসন, পঞ্চ প্রদীপ প্রস্তুত করিত[৩]। গন্ধবণিক্-দের মধ্যে 'দুর্ব্বাসা ঋষি' প্রভৃতি গোত্র ছিল এবং বর্দ্ধমান, উজানী, মহাস্থান প্রভৃতি গ্রামে তাহাদের সমাজস্থান ছিল[৪]। সুবর্ণ-বণিক্গণ রজত, কাঞ্চন বিক্রয় করিত এবং কৌশলে সকলের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিত[৫]। পল্লব গোপেরা 'বাথান' রাখিত ও কান্ধে ভার লইয়া দধি বিক্রয় করিত[৬]। মৎস্যজীবী ও চাষী, এই দুই শ্রেণীর কৈবর্ত্ত ছিল[৭]। কলু, বাইক, বাগদি, মাছুয়া, কোচ, ধোবা ও দরজী, এই সকল ইতর জাতি নিজ নিজ ব্যবসা দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিত[৮]। সিউলীরা খেজুরের রসের গুড় করিত[৯]। ছুতারেরা চিড়া কুটিত, খই ভাজিত এবং শকট ইত্যাদি কাষ্ঠদ্রব্য তৈয়ার করিত[১০]। পাটনী পারাপার করিত[১১]।

১। " মোদক প্রধান নানা করে চিনি কারখানা খণ্ড নাড়ু করয়ে নির্ম্মাণ।
পসরা করিয়া শিরে নগরে নগরে ফিরে শিশুগণ করয়ে যোগান ॥ (ক, ক, চ,)

২। " সরাক বৈসে গুজরাটে জীবজন্তু নাহি কাটে সর্ব্বকাল করে নিরামিষ।
পাইয়া ইনাম বাড়ী বুনে নেত পাটশাড়ি দেখি বড় বীরের হরিষ ॥ (ক ক চ)

৩। " পুরে বৈসে গন্ধবাণ্যা গন্ধ বেচে ধুপ ধুনা পসার সাজায়া চলে হাটে। (ঐ)
" শঙ্খবেনে কাটে শঙ্খ কেহ তারে নহে বঙ্ক মণি বেচে বৈসে গুজরাটে ॥ (ঐ)
" কাঁসারী পাতিয়া শাল ঝারি খুরি গড়ে মাল বাটী খোরা বড় হাণ্ডী দীপ।
সাঁপুড়ি চুনাতি বাটা নির্ম্মায় ঘাঘর ঘণ্টা সিংহাসন পঞ্চপ্রদীপ ॥ (ঐ)

৪। " গোত্রে দুর্ব্বাসা ঋষি কুলে দত্ত বেন্যা।" (ক ক চ)। ফতেপুর, ঘোড়শূল গ্রাম মহাস্থান" ইত্যাদি—(ক ক চ)

৫। " স্বর্ণবণিক্ বৈসে রজত কাঞ্চন কসে পোড়ে ফোড়ে হইলে সংশয়।
দেখিতে দেখিতে জন হরয়ে সভার ধন হাত বদলিতে ভাল জানে ॥" (ঐ)

৬। " পল্লব গোপ বৈসে পুরে কান্ধে ভার বিকি করে বৃষভাগে বসায় বাথানে।" (ঐ)

৭। " মৎস্য বেচে চষে চাষ বৈসে দুই জাতি দাস।" (ঐ)

৮। "...কলুরা নগরে পাতে ঘানী।
বাইতি নিবসে পুরে নানা জাতি বাদ্য করে পুরে ভ্রমে মাঙ্গুরী বিকিনি ॥
বাগদী নিবসে পুরে নানা অস্ত্র ধরি করে দশ বিশ পাইক করি সঙ্গে।
মাছুয়া নিবসে পুরে জাল বুনে মৎস্য মারে কোচগণ বৈসে নানা রঙ্গে ॥
নগর করিয়া শোভা বসিল অনেক ধোবা দড়ায় শুকায় নানা বাসে।
দরজী কাপড় সিয়ে বেতন করিয়া জীয়ে গুজরাটে বৈসে একপাশে ॥ (ঐ)

৯। সিউলি নগরে বৈসে খাজুরের কাটি রসে. গুড় করে বিবিধ বিধানে।" (ঐ)

১০। ছুতার নগর মাঝে চিড়া কোটে খৈ ভাজে কেহ গড়ে শকট বিমানে ॥ (ঐ)

১১। পাটনি নগরে বৈসে রাত্রিদিন জলে ভাসে পার করে লয়ে রাজকর।" (ঐ)

ভাটেরা ভিক্ষা করিত[১]। চৌদ্দুলি, চুণারী, মাঝি, কোরাঙ্গা, ভরদ্বাজী ও মালেরা নগরের বাহিরে বাস করিত[২]। চণ্ডালেরা লবণ, পানিফল ও কেশুর বিক্রয় করিত[৩]। গোহাল্যা গীত গাইয়া বেড়াইত; কোয়ালি ও মারাঠারা নগরের এক দিকে বাস করিত; শোলঙ্গেরা প্লীহা ভাল করিত ও চক্ষের ছানি কাটিত; কোলেরা হাটে ঢোল বাজাইত; জায়জীবী ও কোয়ালা পুরান্তে বাস করিত; হাড়িরা ঘাস কাটিয়া বেচিত ও শুঁড়ীর আঙ্গিনায় মন্ত পান করিত; চামারেরা মোজা, পানই, জিন প্রস্তুত করিত; বয়নীরা চালুনী, ঝাঁটা প্রস্তুত করিত; ডোমেরা টোকা ছাতা তৈয়ার করিত; নগরের এক পার্শ্বে বেশ্যারা বাস করিত[৪]। ব্রাহ্মণেরা 'বল্লান-সেন্যা' অর্থাৎ বল্লালী কৌলিন্য-বিশিষ্ট ছিলেন[৫]। মুসলমানদের মধ্যে গোলা, জোলা, মুকেরি, পীঠারি, কাবারি, গয়সাল, কাণ, সানাকর, তীরকর, পটিয়া, কাগতি, কলন্দর, রঙ্গবেজ, হাজাম, কসাই, দরজি, বেনটা, সৈয়দ, মোগল, পাঠান প্রভৃতি জাতিভেদ ছিল[৬]। তাহারা প্রাতঃকালে লাল পাটি বিছাইয়া নমাজ পড়িত, পীর পয়গম্বরের আরাধনা করিত, কোরাণ পড়িত, পীরের শীরণি দিত, মাথায় কেশ রাখিত না,

---

১।...বৈসে যতেক ভাটে ভিক্ষা মাগি বুলে ঘর ঘর ॥ (ক. ক, চ)

২। চৌদ্দুলি চুনারী মাঝি, কোরাঙ্গা ভরদ্বাজী মাল বৈসে পুরের বাহিরে। (ঐ)

৩। চণ্ডাল নিবসে পুরে লবণ বিক্রয় করে পানীফল কেশুর পশারে। (ঐ)

৪। গোহাল্যা গাইয়া গীত কোয়ালি ফিরয়ে নিত এক ভিতে বসিল মারাঠা।
... ... শোলঙ্গে পিলীহা কাটে ছানি কাটে দিয়া চক্ষে কাঁটা ॥
পুরান্তে নিবসে কোল হাটেতে বাজায় ঢোল জায়জীবী বসিলা কোয়ালা।
কোথা বা বসিল হাড়ি ঘাস কাটি লয় কড়ি শুঁড়ীর অঙ্গনে যায় মেলা॥
মোজা পানই জীন নিরময়ে প্রতিদিন চামার বসিল এক ভিতে।
বয়নী চালুনী ঝাঁটা ডোম গড়ে টোকা ছাতা জীবিকার হেতু একচিতে।
লম্পট পুরুষ আশে বারবধূ জন বৈসে * * * " (ক, ক, চ)

৫। "ব্রাহ্মণের মত নহি বল্লাল-সেন্যা।" (ক, ক, চ)

৬। রোজা নামাজ না করিয়া কেহ হৈল গোলা। তাসন করিয়া নাম ধরাইল জোলা॥
বলদে বাহিয়া নাম বলায় মুকেরি। পীঠা বেচিয়া নাম ধরাল্য পীঠারি॥
মৎস্য বেচিয়া নাম ধরাল্য কাবারী। নিরন্তর মিথ্যা কহে নাহি রাখে দাড়ী॥
হিন্দু হয়ে মুসলমান বৈসে গয়সাল। কাণ হয়ে মাঙ্গ কেহ পায়া নিশাকাল॥
সানা বান্ধিয়া নাম ধরে সানাকর। জীবন উপায় তার পায়া তাঁতি ঘর॥
পট পড়িয়া কেহ ফিরয়ে নগরে। তীরকর হয়ে কেহ নির্ম্মায়েন শরে॥
কাগজ কুটিয়া নাম ধরাল্য কাগতি। কলন্দর হয়ে কেহ ফিরে দিবারাতি॥
বসন রঙ্গায়া কেহ ধরে রঙ্গরেজ। * * * সুন্নত করিয়া নাম বোলাল্য হাজাম।
* * গোমাংস বেচিয়া নাম বোলায় কসাই। ... কাটিয়া কাপড় জোড়ে দরজির ঘটা।
মেয়লে বুনিয়া নাম বোলায় বোনটা।" (ক, ক, চ)

কাবারি জাতি ব্যতীত আর সকলে দাড়ি রাখিত; মাথায় টুপি দিত, ইজার পরিত, আহার করিয়া কাপড়ে হাত মুছিত, নিকা করিত, কুকুড়া ও বকরি জবাই করিয়া তাহার মাংস খাইত, মক্তবে পড়াশুনা করিত[১]। এই সময় হিন্দুগণের মধ্যে শুভ দিন দেখিয়া গর্ভাধান, সাধ ভক্ষণ নামকরণ, কর্ণবেধ, বিদ্যারম্ভ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সংস্কারগুলি যথাযোগ্য শাস্ত্রানুসারে এবং আড়ম্বর ও পান ভোজনের সহিত অনুষ্ঠিত হইত[২]। সন্তান প্রসবের পর চালের খড় দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করা হইত, সূতিকা-ঘরের দ্বারে গোমুণ্ডে ষষ্ঠীমূর্ত্তি স্থাপন করা হইত ও হুলুধ্বনি দ্বারা নাড়ি ছেদন করা হইত[৩]। সূতিকাগারের দুয়ারে জাল, বেত্র ও উপানদ্ ঝুলাইয়া দেওয়া হইত[৪]। প্রসবের তৃতীয় দিবসে প্রসূতিকে পাঁচন খাওয়ান হইত[৫];

১। "আইসে চড়িয়া তাজি সৈয়দ মোগল কাজি খয়রাতে বীর দেয় বাড়ী।
* * ফজর সময়ে উঠি, বিছায়া লোহিত পাটি পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ।
ছিলিমিলি মালা ধরে জপে পীর পয়গম্বরে পীরের মোকামে দেই সাঁজ।
দশ বিশ বেরাদরে বসিয়া বিচার করে অনুদিন কিতাব কোরাণ।
সাঁজে ডালা দেই হাটে পীরের শীরিণি বাঁটে সাঁজে বাজে দগড় নিশান।
বড়ই দানিসবন্দ কাহাকে না করে ছন্দ প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।
ধরয়ে কম্বোজ বেশ মাথে নাহি রাখে কেশ বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি॥
না ছাড়ে আপন পথে দশরেখা টুপি মাথে ইজার পরয়ে দড় করি।
* * আপন টোপর লৈয়া বসিলা গাঁয়ের মিঞা ভুঞ্জিয়া কাপড়ে মুছে হাথ।
সুবলি নেহালি পাখি কুড়ানী বটুয়া ছুরি পাঠান বসিল নানা জাত॥
* * মোল্লা পড়ায়া নিকা, দান পায় সিকা সিকা দোয়া করে কলমা পড়িয়া॥
করে ধরি খর ছুরি কুকুড়া জবাই করি দান পায় কড়ি ছয় বুড়ি।
বকরি জবাই যথা মোল্লারে দেই মাথা * *
যত শিশু মুসলমান মক্তবে তুলিল খান মথদম পড়ায় পঠনা। (ক, ক, চ)

২। "সকল দোষহীন বিচার করিল দিন প্রথম গর্ভের সঞ্চার।
* * সোঙরি পুরন্দর দম্পতি জুড়ি কর মিহিরে দিল অর্ঘ্য দান।" (ক, ক, চণ্ডী, খুল্লনার গর্ভসঞ্চার)
"নিদয়া সাধ হেতু ঘরে ঘরে ধর্ম্মকেতু চাহিয়া আনিল আয়োজন।" (ক, ক, চ, নিদয়ার মনের কথা, সাধভক্ষণ)
চারি পাঁচ মাস গেল হয়ে পরবেশ। * * * গণক আনিয়া নাম থুইল কালকেতু।
* * পঞ্চম বয়সে কৈল শ্রবণ বেধন।" (ক, ক, চ, ব্যাধনন্দনের নামকরণ ও কর্ণবেধ)
শুনি বাক্য খুল্লনায় দ্বিজ কৈল অঙ্গীকার হাতে খড়ি দিল শুভক্ষণে। (ক, ক, চ)
ত্রয়োদশী রবিবার নক্ষত্র রেবতী। বিবাহে সঞ্জয়কেতু দিল অনুমতি।" (ক, ক, চ)
ক, ক, চ, ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধের আয়োজন, কুটুম্বসমাগম, শ্রাদ্ধ সমাপন, দ্রষ্টব্য)

৩। "কাড়িয়া চালের খড় জ্বালিল আউড়ি। দ্বারে স্থাপিল ষষ্ঠী স্থাপিল গোমুড়ী।" "হুলাহুলি দিয়া কৈল নাড়ির ছেদন" (ক, ক, চ)

৪। "দুয়ারে বাঁধিল জাল বেত্র উপানৎ।" (ক, ক, চ)

৫। তিন দিনে কৈল তার সুপথ্য পাচন। (ক, ক, চ)

ছয় দিনে রাত্রি জাগরণপূর্ব্বক ষষ্ঠীপূজা, সপ্তম দিনে সপ্তঋষির অর্চ্চনা, অষ্টম দিনে অষ্টকলাই, নবম দিনে নত্তা, একুশ দিনে ষষ্ঠীপূজা করা হইত[১]। শিশুকে ঘুম পাড়াইবার নিমিত্ত এখনকার ন্যায় তখনও ছড়াগান প্রচলিত ছিল[২]; স্ত্রীলোকেরা দোছুটী করিয়া বার হাত শাড়ী পরিত[৩], মাঘ মাসে প্রাতঃস্নান করিয়া ধনশালী গৃহস্থেরা সুপাঠকের মুখে পুরাণ পাঠ শ্রবণ করিতেন[৪]; ব্রাহ্মণ সজ্জনেরা খড়্গা-নির্ম্মিত কোষার তর্পণ করিতেন[৫]; মেয়েরা 'গুয়ামুটী' নামক একপ্রকার খোঁপা বাঁধিত ও দর্পণে মুখ দেখিত[৬]; পুরুষেরা মাথায় পাগড়ী ও গায়ে পাছড়া ব্যবহার করিত[৭]; মেঘডুম্বুর নামক শাড়ী ও কাঁচুলী ধনী স্ত্রীলোকদিগের পোষাক ছিল[৮]; তাহারা 'কজ্জল' পরিত, পিঠালী ও হলুদ মাখিয়া গায়ের ময়লা পরিষ্কার করিত, কুলুপিয়া ও 'শ্রীরাম লক্ষ্মণ' নামক শঙ্খ পরিধান করিত[৯]; গরীবেরা 'আমানি' ভক্ষণ করিত[১০]; বিবাহের সময় স্ত্রীআচার হইত এবং বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীগণ মধ্যে দ্বন্দ্ব চলিত,[১১] স্ত্রীআচারকালে কাপাসের ক্ষেত হইতে গোমুণ্ড আনিয়া তদুপরি বরকে দাঁড় করাইয়া রাখার নিয়ম ছিল[১২]; যুবতীরা 'স্বামীর সম্ভোগচাঁদ' এর

১। ছয় দিনে কৈল ষষ্ঠী পূজা জাগরণ। সপ্তম দিনে সপ্ত ঋষি করিল অর্চ্চনা। অষ্ট দিনে অষ্ট কলাই করিল লহনা। নয় দিনে নত্তা করিল মনের হরিষে। ষষ্ঠী পূজা কৈল তার মনের হরিষে। (ক ক চ)

২। 'শ্রীমন্তের ঘুমপাড়ানী গান' দ্রষ্টব্য।

৩। দোছুটি করিয়া পরে বার হাত সাড়ী। (ক ক চ)

৪। মাঘ মাসে প্রভাতে করিবে স্নানদান। সুপাঠক আনি দিব শুনিবে পুরাণ। (ক, ক, চ)

৫। ফুল্লরা বেচয়ে খড়গ দরে এক পণ। ব্রাহ্মণ সজ্জনে কিনে করিতে তর্পণ। (ঐ)

৬। কবরী বাঁধিল রামা নাম গুয়ামুটি। দর্পণে নিহালি দেখে যেন গুয়াগুটি। (ঐ)

৭। মস্তকে পাগ দিল গায়েতে পাছড়া। (ক ক চ)

৮। বাছিয়া পরয়ে মেঘডুম্বুর কাপড়।" কাঁচুলী পরিয়া মাতা বসিলা দুয়ারে। (ক, ক, চ)

৯। কজ্জল গরল বিশিখ প্রবল ধরসি কিবা কারণে ॥
পিঠালী হরিদ্রা লয়্যা, খুল্লনারে বুলি চায়্যা, করিতে অঙ্গের মলা দূর।"
"দুই করে কুলুপিয়া শঙ্খ।" "কেমতে পুড়িল শঙ্খ শ্রীরাম লক্ষ্মণ।" (ঐ)

১০। "আমানি খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান ॥ (ঐ) পাথরে আমানী ভরি দিল সপ্তয়ের নারী (ঐ)

১১। রম্ভাবতী করিল আচার যথাবিধি। পায়ে পাদ্য শিরে অর্ঘ্য ঢালি দিল দধি ॥
বরসুতা দিয়া মাপে বরের অধর। তেন মত মাপে আর দুইখানি কর ॥
* * আনিল আইয়োর সূতা নাটাই সহিত। সাত ফের ফেরাইয়া করিয়া বেষ্টিত ॥ (ঐ)
জুড়িয়া ক্রোশেক বাট চলে বরযাত্র ঠাট সচকিত ইছানি নগর।
* * দুই দলে মিলামিলি গালাগালি চুল চুলি বরযাত্রী কেউড়ি না ছাড়ে ॥" (ঐ)
কেহ আগাইয়া বীরে ওড় চাটলি মারে" (ঐ, কালকেতুর বিবাহ)।

১২। কাপাসের বাড়ী হইতে আনিল গোমুণ্ড। দাণ্ডাইয়া সাধু তার রবে দুই দণ্ড।
খুল্লনা করিবে যদি সাধুর অপমান। মৌনে রহিবে সাধু গোমুণ্ড সমান। (ক, ক, চ)

সহিত 'বাঘতেল' মিশাইয়া, তাহা মুখে মাখিয়া 'স্বামি-বশীকরণের' চেষ্টা করিত[১]; স্ত্রী-লোকেরা রক্তবস্ত্র পরিয়া, মাথার চুল এলাইয়া, মঙ্গলবারে, অষ্টমী, নবমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিত এবং চণ্ডীর ঘট মাথায় করিয়া নাচিয়া বেড়াইত[২]; চণ্ডীর নিকট শূকর, (এমন কি, চুপে চুপে) নরবলি পর্য্যন্ত দেওয়া হইত; মহিষ, ছাগ, মেষ, রোহিত ও রাজহংস বলি হইত এবং সময়ে সময়ে পূজক নিজের অঙ্গ কাটিয়া রুধির উৎসর্গ করিতেন[৩]; গণ্ডাচার্য্যেরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাঁজি শুনাইয়া ও কুশাই ওঝারা কাঁধে কুশের বোঝা লইয়া, বেদমন্ত্র পড়িয়া লোকের নিকট কড়ি আদায় করিত[৪]; বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, কার্ত্তিক ও মাঘমাসে নিরামিষ ভক্ষণ ও উপবাস করিবার প্রথা ছিল এবং ঐ সকল মাস পুণ্যমাস বলিয়া বিবেচিত হইত; বৈশাখ মাসে ব্রাহ্মণকে দান করা এবং মাঘমাসে প্রাতঃস্নান ও দান করা, সুপাঠক আনিয়া পুরাণপাঠ শ্রবণ করা, পিষ্টক ও পায়স ভোজন করার রীতি ছিল[৫]; মাঙ্গলিক কার্য্যে 'কৃষ্ণচরিত্র' গান করিবার এবং ভাগবত ও ভারত পুরাণ পাঠ করিবার প্রথা ছিল[৬]; আশ্বিন মাসে অম্বিকাপূজা ও ফাল্গুনে দোলযাত্রা উৎসব হইত[৭];

১। স্বামীর সন্তোষচাঁদ রাখিবে যতনে। বাঘতেল সনে বামা মাখিবে বদনে। (ক, খ, চ,)

২। পরিয়া লোহিত বাস, আকুল কুন্তলপাশ, বোড় ফিরে দিয়া হুলাহুলি।
দেখিছি আপন চক্ষে কাওরী কামাখ্যা মুখে দেয় ওড় ফুলের অঞ্জলি।
যদি পায় গুণবতী মঙ্গল অষ্টমী তিথি যদিবা নবমী চতুর্দ্দশী।
পাইয়া এমন তিথি পূজা করে নিতি নিতি উপবাসী থাকে দিবা নিশি। (ঐ)

৩। মহিষ ছাগ মেষ রোহিত রাজহংস লক্ষেক দিল বলিদান। (ঐ)
তুমি নীচ পশু নাহি ছাড় বরা। মোরে কিবা বলি দিয়া পুজিবে চণ্ডিকা। (ঐ)

৪। প্রবেশিতে হাট মাঝে আসি হরি মহারাজে ডাকে মীন রাশির কল্যাণ।
আশীষ তোমারে গর্জ্জি আসিয়া শুনাল্য পঞ্জী, তারে দিলুঁ কাহনেক দান।
কান্ধে কুশের বোঝা, নগরে কুশাই ওঝা, বেদ পড়ি করিল আশীষ।
ইচ্ছিয়া তোমার যশ, দিলুঁ তারে পণ দশ ... ...। (ঐ)

৫। পুণ্য বৈশাখ মাস পুণ্য বৈশাখ মাস। দান দিয়ে দ্বিজের পুরিবে অভিলাষ।
পুণ্য কার্ত্তিক মাস পুণ্য কার্ত্তিক মাস। দান দিয়া তুষিবে দ্বিজের অভিলাষ।
মাঘ মাসে প্রভাতে করিবে স্নান দান। সুপাঠক আনি দ্বিজ শুনিবে পুরাণ।
পিষ্টক পায়স যোগাইব প্রতিদিন। আনন্দে করিবে নাথ মাঘ নিরামিষ।
... ... নানাবিধ দান নাথ দিবেক ব্রাহ্মণে।
বৈশাখ হল্য বিষ গো বৈশাখ হল্য বিষ। মাংস নাহি খায় সর্ব্বলোক নিরামিষ। (ঐ)
পাঠকে পুরাণ পড়ে জ্যৈষ্ঠের মহিমা। জ্যৈষ্ঠেতে চন্দন দান সুকৃতির সীমা। (ঐ)

৬। এথাই নরক স্বর্গ বলে ভাগবতে।
দুর্ব্বলা কিঙ্করী গায় কৃষ্ণের চরিত। ... কেহ পড়ে ভারত পুরাণ। (ঐ)

৭। আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করে জগজ্জনে। (ঐ)
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করিবে হরিষে। ষোল উপচার দিয়া ছাগল মহিষে॥
ফাগুনে ফুটিবে ফুল মোর উপবনে। তখি দোলমঞ্চ নাথ করিবে নির্ম্মাণে। (ঐ)

দোলযাত্রা উৎসবে হরিদ্রা ও কুঙ্কুমের পিচকারী দেওয়া হইত[১]; বণিকেরা গন্ধেশ্বরীর পূজা করিত[২]; শীতকালে তুলিপাড়ি, তসর বসন, পাছুড়ী ও নেহালী নামক শীতবস্ত্র ব্যবহার করিত[৩]; গরীবেরা 'আগুন ও রৌদ্র' পোহাইত এবং 'খোসলা' নামক শীতবস্ত্র দ্বারা শীত নিবারণ করিত[৪]; 'শাঙলী গামছা' নামক এক প্রকার গামছার প্রচলন ছিল[৫]; বিলাসীরা কাণে স্বর্ণালঙ্কার ধারণ করিত, গায়ে চন্দন মাখিত এবং মুখে গুয়া ও হাতে পান লইয়া, তসরের কাপড় পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত[৬]; 'উপানৎ' বা জুতা প্রচলন ছিল; লোকে শয়নের পূর্ব্বে পা ধুইয়া পাদুকা ব্যবহার করিত[৭]; মাঙ্গলিক কার্য্যে কদলীবৃক্ষ রোপণ, নাট্যগীত ও বিয়াল্লিশ বাজনা হইত[৮]; লোকেরা মস্তকে পাগড়ী, পরিধানে ধুতি, গায়ে 'পাছড়া', 'খাসাজোড়া', 'ধোকড়ি', 'খুঞা', 'খোসলা' প্রভৃতি বস্ত্র ব্যবহার করিত[৯]; বাঙ্গালী পাইক খাঁড়া, ফলা, বিজুলী, রেজা, রায়বাঁশ, লেজা প্রভৃতি অস্ত্রচালনায় নিপুণ ছিল[১০]; বাউরীরা দোলা বহন করিত[১১]; তাম্বু, আতপত্র, ভোটকম্বল, ময়ূরপাখা, গঙ্গাজলি পাটি প্রভৃতির প্রচলন ছিল[১২]; লোকে হাঁচি জেঠির

১। হরিদ্রা কুঙ্কুমে নাথ দিবে পিচকারী। (ক, ক, চ)

২। টলে সাধু লক্ষপতি, দিল গন্ধেশ্বরীর দোহাই।" (ঐ)

৩। তুলিপাড়ি পাছুড়ী শীতের নিবারণ।" (ঐ) পৌষ তুলিপাড়ি হৈল তাম্বুল তপনে। শীতনিবারণ দিব তসর বসনে।" (ঐ) "নেয়াল বুনিয়া নাম বোলায় বেনটা।" (ঐ)

৪। হরিণ বদলে পাইনু পুরাণ খোসলা। উড়িতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধুলা। (ঐ)
জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ। (ঐ)

৫। সাঙলী গামছা দিব ভূষিত কস্তুরী। (ঐ)

৬। নগরে নাগর জনা কানে লম্বমান সোনা বদনে গুবাক হাতে পান।
চন্দনে চর্চ্চিত তনু হেন দেখি যেন ভানু তসর বসন পরিধান॥ (ঐ)

৭। দুয়ারে বাঁধিল জাল, বেত্র, উপানৎ। (ঐ)
চরণে পাদুকা দিয়া করিল গমন। বিনোদ মন্দিরে সাধু করিল শয়ন। (ঐ)

৮। প্রতিদ্বারে রম্ভাতরু কৈল আরোপণ।...ঘরে ঘরে গীত নাট বিয়াল্লিশ বাজনা। (ঐ)

৯। কাহণেক কড়ি দিল ধুতি একখান॥ মস্তকের পাগ দিল গায়ের পাছড়া। ব্রাহ্মণ বন্দীরে সাধু দিল খাসাজোড়া॥" (ঐ) সওদাগর আচ্ছাদন না ছাড়ে ধোকড়ি। (ঐ)
কাকাঁলে তুলিয়া বাঁধি খুঞা ধুতিখানি।... অঙ্গে দিতে নাহি আটে খোসলা বসন। (ঐ)

১০। খেলে পাইক বাঙ্গালী খাণ্ডা ফলা বিজুলী কেহ বিন্ধে পুতিয়া রেজা।
মণ্ডলী করিয়া ধায় রায়বাঁশিয়া কেহ ধায় ফিরায়ে লেজা। (ঐ)

১১। গমনের শুভবেলা, বাউরী যোগায় দোলা। (ঐ)

১২। টাঙ্গায়া তাম্বুঘর বসিলা সদাগর। (ঐ)
শিখিপুচ্ছবিরচিত মণিমুক্তা উপনীত আতপত্রে শোভে রাঙ্গা ডাটি।
একশত পঞ্চাশ ভোটকম্বল গড়াবাস, ময়ূর পাখার গঙ্গাজলী পাটি। (ঐ)

বাধা মানিত[১] ; 'মসীপত্রে' চুক্তি লেখা হইত[২] ; বিদেশ যাত্রাকালে যাত্রীরা রাস্তায় কখন 'রন্ধন করিয়া' আহার করিত, কখন 'চিড়া কলা' ভোজন করিত[৩] ; পুরুষের একাধিক বিবাহ করিবার প্রথা ছিল[৪] ; মাথায় ও শরীরে তেল মাখিবার প্রথা ছিল[৫] ; পাঠশালায় সাধারণতঃ ক খ গ, আঠার ফলা, রক্ষিত পঞ্জিকা, টীকা, 'ন্যায়,' কোষ, গণবৃত্তি, দণ্ডী, পিঙ্গল, ভারবি, মাঘ, জয়দেব প্রভৃতির গ্রন্থ, ব্যাসের জৈমিনি ভারত, কালিদাসের মেঘদূত ও কুমার-সম্ভব, নৈষধচরিত, 'রাঘব পাণ্ডবীয়', 'সপ্তশতী', 'মুদ্রারাক্ষস', 'মালতীমাধব', হিতোপদেশ, 'বাসবদত্তা', 'কামন্দকীয় নীতিশাস্ত্র', দীপিকা, ভাস্বতী, 'কাব্যপ্রকাশ' রত্নাবলী, সাহিত্যদর্পণ, 'বৈদ্যকশাস্ত্র', 'জ্যোতিষশাস্ত্র' প্রভৃতি পড়ান হইত[৬] ; সভায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির চরণে জল, কপালে চন্দন ও গলায় মালা দিয়া সম্মান করা হইত[৭] ; 'গুবাক ও সন্দেশ' পাঠাইয়া নিমন্ত্রণ করা হইত[৮] ; খট্টায় 'তুলী' পাড়িয়া মশারি টাঙ্গান হইত[৯] ; চিকাকড়ি, বিপক্ষিকা, সট্কা, কোড় ভেটা, বাঘচালি, জুয়া, মালি, অক্ষ, ভেড়ার যুদ্ধ প্রভৃতি ক্রীড়া প্রচলিত ছিল[১০] ; হীরা, নীলা, মতি, প্রবাল প্রভৃতি সংযুক্ত অলঙ্কার, কণ্ঠমালা, কুণ্ডল,

---

১। সদাগর পাছে নড়ে হাঁচি জেঠি বাধা পড়ে। (ক ক চ)

২। মসীপত্রে লিখন করিল সভাজন। (ঐ)

৩। কোথায় রন্ধন কোথা চিড়াখণ্ড কলা ॥ (ক, ক, চ)

৪। সাত সতা গৃহে বাস বিষম জঞ্জাল। (ঐ)
কপূর তাম্বূল খায়্যা দু সতীনে থাকে শুয়্যা (ঐ)

৫। "তৈল বিহনে তার গায়ে উঠে খড়ি। (ঐ)

৬। পড়য়ে সাধুর বালা ক খ গ আঠার ফলা সুবিহানে করিয়া যতনে।
রক্ষিত পঞ্জিকা টীকা ন্যায়কোষ নাটিকা গণবৃত্তি আর ব্যাকরণ।"
পড়িল কথন দণ্ডী করিতে কবিত্ব খণ্ডী নানা ছন্দ পড়িল পিঙ্গল।
করি দৃঢ় অনুরাগে পড়িল ভারবি মাঘে বন্ধুজনে বাড়ে কুতুহল ॥
জৈমিনি ভারতামৃত ব্যাস পড়ে মেঘদূত নৈষধ কুমারসম্ভব।
দিবানিশি নাহি জানি পড়ে রঘু যেত মুনি রাঘব পাণ্ডবী জয়দেব ॥
অব্যাহত বুদ্ধিগতি পড়ে দুই সপ্তসতী পড়ে মুদ্রা মুরারি মালতী।
হিত উপদেশ কথা পড়িল বাসবদত্তা কামন্দকী দীপিকা ভাস্বতী ॥
কাব্যপ্রকাশ পড়ি অভ্যাস করিল বড়ি, রত্নাবলী সাহিত্যদর্পণে।
...বৈদ্যক জ্যোতিষ যত বিশেষ বলিব কত একে একে পড়িল শ্রীপতি।" (ঐ)

৭। "আগে জল দিল [চাঁদ বেনের] চরণে। কপালে চন্দন দিয়া মালা দিল গলে।" (ঐ)

৮। "ব্যবহার গুবাক সন্দেশ নিমন্ত্রণ।" (ঐ)

৯। "খট্টায় পাড়িয়া তুলী টাঙ্গায় মশারি জালি।" (ঐ)

১০। "খেলে কড়ি চিকা কোড় ভেটা'। (ঐ)
"পাশকে হইয়া বশ ডাকে বিছু দশ দশ বিপক্ষিকা খেলেন সটকা।
পাতি খেলে বাঘচালি, জুয়া খেলে পাতি বাজি সামরল শুনাইতে কথা।" (ঐ)

স্বর্ণচুড়ি, মুকুতার বেড়ী, সুবর্ণ কাঁঠি, কনক শিকলি, নূপুর, কিঙ্কিণী, মল ও বাঁকি, অঙ্গুরী, পাশলি, বালা, শাঁখা, অঙ্গদ প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রচলন ছিল[১] ; ভদ্রলোকেরা 'লম্বা কোঁচা' করিয়া কাপড় পড়িত[২] ; স্ত্রীলোকেরা শিরে তৈল দিয়া কবরী বান্ধিত ও সরস সিন্দুর কপালে পরিত[৩] ; তাহারা পরস্পর দেখা হইলে মাথার 'উকুণী' তুলাইয়া লইত[৪] ; কড়ি দিয়া লোকে বেসাতি করিত[৫] ; দরিদ্রেরা 'খুদের জাউ', লবণ, কলমি ও পুতি শাক খাইয়া জীবনধারণ করিত ও 'চিড়া খই মুড়ি' জলযোগ করিত[৬] ; এ কালের ন্যায় সে কালেও 'বাঙ্গালেরাই মাঝির কার্য্যে পটু ছিল[৭] ; শঙ্খ, ঘণ্টা, ডম্ফ, মৃদঙ্গ, জগঝম্প, ডম্বরু, বিষাণ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ছিল[৮] ; ঝাঁট ও জল দিয়া ভোজনের ঠাঁই করিত[৯] ; পা ধুইয়া ও জল দিয়া মুখ প্রক্ষালন করিয়া ভোজনে বসিত[১০] ; জনার্দ্দন স্মরণ করিয়া, গণ্ডূষ করিয়া ভোজনে

"লয়ে নিজ পারাবত চলে ধনপতি দত্ত লড়াইতে নগরিয়া সাথে।" (ক ক চ)
"জোড়া জোড়া খাসি নিল যুঝারিয়া ভেড়া।" (ঐ)

১। হীরা নীলা মতি পলা কলধৌত কণ্ঠমালা কুণ্ডল কিনিল স্বর্ণচুড়ি।
পুরাতে জায়ার সাধ কিনিল পাটের জাদ মণিময় মুকুতার বেড়ি।" (ঐ)
"বিচিত্র কপাল তটি গলায় সুবর্ণ-কাঁঠি কটিতটে শোভে আর কনকশিকলি। * * *
পদযুগে মল বাঁকি করে ঝলমলি।" (ঐ)
"সুবর্ণ কিঙ্কিণী সাজে।" "রজত পাশলি ছটি" (ঐ) "সর্ব্বাঙ্গে চন্দন পঙ্ক, অঙ্গদ বলয়া শঙ্খ।"
মানিকের অঙ্গুরী। মণিময় কাঞ্চন নূপুর। (ঐ)

২। "মাগের বসন পরে ভূমে নামে কোঁচা। পাগখানি বাঁধে ভাঁড় নাহি ঢাকে কেশ।" (ঐ)

৩। "শিরে তৈল দিয়া তার বাঁধিল কবরী। সরস সিন্দুর ভালে দিল সহচরী।" (ঐ)

৪। মোর মাথার গোটা চারি দেখহ উকুণী।" (ঐ)

৫। "কাহণ পঞ্চাশ কড়ি লয়্যা চলহ বাজার।" (ঐ)

৬। "কাঁচড়া খুদের জাউ রান্ধিহ যতনে।" (ঐ)
"রাঁধিবে পুতির শাক হাঁড়ি দুই তিন। লবণের তরে চারি কড়া কর ঋণ।" (ঐ)
"মুড়ি দুই তিন রান্ধি কলমী কাঁচড়া।" (ঐ)
"আঁচল ভরিয়া সই দিল খই মুড়ি।" "ছুতার নগর মাঝে চিড়া কোটে খই ভাজে।" (ঐ)

৭। কাঁদে রে বাঙ্গাল ভাই বাপোই বাপোই। কুক্ষণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই।
আর বাঙ্গাল কান্দে শোকে শিরে দিয়া হাত। হলদী গুঁড়া হারাইল গুকুতার পাত। ইত্যাদি (ঐ)

৮। শঙ্খ ঘণ্টা ডম্ফ মৃদঙ্গ জগঝম্প বাজয়ে ডম্বরু বিষাণ।" (ঐ)
"ছায়ামণ্ডপ মাঝে ঢেমচা দগড় বাজে" (ঐ)। "মৃদঙ্গ মন্দিরা বায় (ঐ)

৯। ঝাঁটিজল দিয়া কৈল ভোজনের স্থল।" (ঐ)

১০। "পা পাখালিয়া বীর জল দিল মুখে।
ভোজন করিতে বীর বসিলা কৌতুকে।" (ঐ)

বসিত[১]। মুকুন্দরাম তৎকালের বড়লোকদের শয্যারচনা ও রন্ধন-প্রণালীর জীবন্ত চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল,—

দুর্ব্বলার শয্যারচনা

"সাধুর আদেশ ধ'রে প্রবেশি শয়ন-ঘরে খট্টা করে চন্দনে ভূষিত।
সুগন্ধি পুষ্পের দামে আমোদিত কৈল ধামে লহনার উচাটন চিত॥

দুর্ব্বলা আয়াস-ঘরে বিছায় শয়ন।

দড়ি করিয়া আঁট প্রথমে বিছায় খাট তুলিকা মসারি সাজে ঝাঁপা।
কিতা করিয়া বাঁধা উপরে টানাল্য চাঁদা বিছায় মালতী যূথী চাঁপা॥
ধবল চামর বাঁধা উপরে টাঙ্গায় চান্দা প্রতি চালে মুকুতার ঝারা।
পাটের মশারি বেড় ভূমে নামে গজ দেড় মাঝে মাঝে লাল পাটের ডোরা॥
দুই দিগে থাল বাটী জলে পুরা গাড়ু ঘটি দুই দিকে রাখে দুই পাখা।
বাটা ভরি বীড়া গুয়া কুঙ্কুম কস্তুরী চুয়া সুগন্ধি প্রসূন মদলেখা॥
শয্যা বিছায়া দাসী ধরিতে না পারে হাসি বার চারি গড়াগড়ি যায়।"

খুল্লনার রন্ধন

"প্রভুর আদেশ ধরি রান্ধয়ে খুল্লনা নারী সোঙরিয়া সর্ব্বমঙ্গলা।
তৈল ঘৃত লবণ ঝাল আদি নানা বস্তুজাল সহচরী যোগায় দুর্ব্বলা॥
বাইগুন কুমড়াকড়া কাঁচকলা দিয়া শাড়া বেসার পিঠালি ঘন কাঠি।
ঘৃতে সম্ভোলিল তথি হিঙ্গু জীরা দিয়া মেথি শুক্তা রন্ধন পরিপাটী॥
ঘৃতে ভাজে পলা কড়ি নৈটা শাকে ফুলবড়ি চিঙ্গড়ি কাঁটাল-বিচী দিয়া।
ঘৃতে নালিতার শাক তৈলে বাস্তুক পাক খণ্ডে বড়ি ফেলিল ভাজিয়া॥
দুধে লাউ দিয়া খণ্ড জ্বাল দিল দুই দণ্ড সম্ভোলিল মহুরীর বাসে।
মুগ সূপে ইক্ষুরস কৈ ভাজে পল দশ মরিচ গুঁড়িয়া আদারসে॥
মশুরী মিশ্রিত মাস সূপ রাঁধে রসবাস হিঙ্গু জিরা বাসে সুবাসিত।
ভাজে চিথলের কোল রোহিতমৎস্যের ঝোল মানবড়ি মরিচে ভূষিত॥
বোয়ালি হেলঞ্চ শাক কাঠি দিয়া কৈল পাক ঘন বেসার সম্ভোলন তৈলে॥
কিছু ভাজে রাইখড়া চিঙ্গুড়ির তৈলে বড়া খরসোলা পুঙ্গী দশ তোলে॥
করিয়া কণ্টকহীন আম্রে শকুল মীন খর লোন দিয়া ঘন কাঠি॥
রাধিল পাঁকাল ঝষ দিয়া তেঁতুলের রস ক্ষীর রাঁধে জ্বাল করি ভাঁটি॥
কলাবড়া মুগ সাউলি ক্ষীরমোন্না ক্ষীরপুলি নানা পিঠা রাঁধে অবশেষ।
অন্ন রাঁধে অবশেষে শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে পণ্ডিত রন্ধন উপদেশে॥

১। "সোঙরিল জনার্দ্দন প্রধান পুরুষ।
দুর্ব্বলীজলে সাধু করিল গণ্ডুষ।" (ক ক চ)

এই সময় যাত্রাকালে উচোট লাগা, আঁচলে কাঁটা ফোটা, ডোমচিল মাথার উপরে উড়া, কাঠুরিয়া কাষ্ঠভার লইয়া আসা, শুকান ডালে কাউয়া ডাকা, যোগিনীর ভিক্ষা মাগা, খণ্ডিত লাউ দেখা, কমঠ লইয়া ধীবর চলিয়া যাওয়া, তেলির 'তৈল লবে, তৈল লবে' বলিয়া চীৎকার করা, বামে ভুজঙ্গ ও দক্ষিণে শৃগাল দর্শন অশুভ চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত হইত[১]।

৮। কৃষ্ণচন্দ্র-সাহিত্যে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবন ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের পরিচয়। ১৭১০ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্যের জীবনকাহিনী ও ধর্ম্মভাব লইয়া যে সাহিত্য গঠিত হইয়াছিল, তাহাকে আমরা 'শ্রীচৈতন্যসাহিত্য' আখ্যা প্রদান করিয়াছি। কিন্তু 'কৃষ্ণচন্দ্র-সাহিত্য' শব্দ আমরা ঐরূপ অর্থে এখানে ব্যবহার করিতেছি না। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাঙ্গালা সাহিত্যের একজন অদ্বিতীয় উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁহার আশ্রয়ে ও উৎসাহে যে সাহিত্য বিরচিত হইয়াছে, আমরা এ স্থলে তাহাকেই কৃষ্ণচন্দ্র-সাহিত্য নামে আখ্যাত করিয়াছি। এই যুগের প্রধান কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর এবং এই যুগকেই প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্তিম যুগবলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই যুগের অপর প্রধান কবি কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন। এই কবিদ্বয়ের রচনা হইতে বাঙ্গালীর তাৎকালিক আচার ব্যবহারের এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই সময় ব্রাহ্মণেরা সাধারণতঃ বেদ, ব্যাকরণ, অভিধান, স্মৃতি ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিত[২]। ঘরে ঘরে দেবালয় ছিল। তথায় শিবপূজা, চণ্ডীপাঠ, যজ্ঞ, মহোৎসব ও শঙ্খঘণ্টাধ্বনি হইত[৩]। বৈদ্যেরা সাধারণতঃ চিকিৎসাবৃত্তিক ছিল[৪] এবং কায়স্থেরা নানাপ্রকার রাজকার্য্য দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিত[৫]। বণিকেরা মণি, গন্ধ, সোনা, কাঁসারী ও শাঁখারী, এই পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল[৬]। এতদ্ব্যতীত গোয়ালা, তাম্বুলী, তিলি, তাঁতি, মালাকর, নাপিত, বারুই, কুরী, কামার, কুমার, আগরি, যুগি, চাষাধোপা, চাষাকৈবর্ত্ত, সেকরা, ছুতার, শুঁড়ী, ধোবা, জেলে, চাঁড়াল, বাগদী, হাড়ী, ডোম, মুচী, কুরমী, কোচঙ্গা, পোদ,

---

১। "ঘর হৈতে বাহির হৈলে লাগিল উচোট। নেতের আচলে লাগে শিয়াকুল কাঁটা॥
যাত্রার সময় ডোম চিল উড়ে মাথে। কাঠুরিয়া কাষ্ঠভার লয়ে আইসে পথে॥
শুকনা ডালেতে বসা কু বোলয় কাউ। যোগিনী মাঙ্গয়ে ভিক্ষা অর্দ্ধখান লাউ॥
কমঠ লইয়া পথে ধীবর চলি যায়। তৈল লবে তৈল লবে বলি তেলিয়া বোলয়॥
চলিলেন সদাগর মনে কুতূহলী। বামদিকে ভুজঙ্গম দক্ষিণে শৃগালী॥ (ক, ক, চ)

২। "ব্রাহ্মণ মণ্ডলে দেখে বেদ অধ্যয়ন। ব্যাকরণ অভিধান স্মৃতি দরশন॥" (ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর)

৩। "ঘরে ঘরে দেবালয় শঙ্খ ঘণ্টারব। শিবপূজা চণ্ডীপাঠ যজ্ঞ মহোৎসব॥" (ঐ)

৪। "বৈদ্য দেখে নাড়ী ধরি কহে ব্যাধিভেদ। চিকিৎসা করয়ে পরে কাব্য আয়ুর্ব্বেদ॥" (ঐ)

৫। "কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারী॥" (ঐ)

৬। "বেণে মণি গন্ধ সোণা কাঁসারী শাঁখারী॥" (ঐ)

কপালী, তিয়র, কোল, কলু, ব্যাধ, বেদে,মালি, বাজীকর, বাইতি, পটুয়া, কান, কসবী প্রভৃতি জাতির উল্লেখ ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে প্রাপ্ত হওয়া যায়[১]। পুকুরের বাঁধা ঘাটে শিবালয় প্রতিষ্ঠা করার রীতি ছিল[২]। স্ত্রীলোকেরা 'গালভরা গুয়াপান' রাখিত[৩]। কড়ি দিয়া হাটবাজার করার প্রথা তখনও প্রচলিত ছিল[৪]। তখনও কড়ি হইলে বুড়ার বিবাহ হইত[৫]। হাটে সাধারণতঃ সন্দেশ, চিনি, ভূরা, ঘৃত, পান, গুয়া, দুগ্ধ, চুন, কাষ্ঠ পাওয়া যাইত এবং চন্দন, চুয়া, লঙ্গ, জায়ফল দুর্লভ ছিল[৬]। সধবারা আয়তির লক্ষণস্বরূপ একগাছি লোহা ধারণ করিত[৭] ও চুলে তৈল দিত[৮]। সন্তানের নাড়ীচ্ছেদের সময় হুলুধ্বনি দেওয়া হইত[৯]। সন্তান জন্মিবার পর ষষ্ঠীপূজা হইত ও ছয় মাসে অন্নপ্রাশন হইত[১০]। এই সময় গৃহস্থেরা অতিথি সেবা করা পুণ্যজনক বিবেচনা করিত[১১]। সতীদাহ-প্রথা তখন প্রচলিত ছিল[১২]। সুবচনী পূজা প্রচলিত ছিল[১৩]। তাকিয়া, গিরদা, চিকণ মশারি প্রভৃতি শয্যা; মণ্ডা, মনোহরা, সরভাজা, নিখতি, বাতাসা, রসকরা, এলাইচদানা, সন্দেশ, ফুলচিনি, লুচি, দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, ছানা প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্যের প্রচলন ছিল[১৪]।

১। গোয়ালা তাম্বূলী তিলী তাঁতি মালাকর। নাপিত বারুই কুরী কামার কুমার।।
আগরি প্রভৃতি আর নাগরী যতেক। যুগি চাষাধোপা চাষী কৈবর্ত্ত অনেক।।
সেকরা ছুতার সুরী ধোবা জেলে গুড়ী। চাড়াল বাগদী হাড়ী ডোম মুচী শুঁড়ী।।
কুরমী কোরঙ্গা পোদ কপালী তিয়র। কোল কলু ব্যাধিবেদে মালি বাজীকর।।
বাইতি পটুয়া কান কসবী যতেক। ভারক ভক্তিয়া ভাঁড় নর্ত্তক অনেক।। (ভারতচন্দ্র)

২। সম্মুখে দেখেন সরোবর মনোহর। সানে বান্ধা চারি ঘাটে শিবালয় চারি। (ভা, বিদ্যাসুন্দর)

৩। গাল ভরা গুয়া পান পাকি মালা গলে।" (ঐ)

৪। আমি হাট বাজার করিব। কড়ি কর বিতরণ ইত্যাদি (ঐ)

৫। কড়িতে বুড়ার বিয়া, কড়ি লোভে মরে গিয়া কুলবধূ ভুলে কড়ি দিলে। (ঐ)

৬। সেরের কাহন দরে কিনিনু সন্দেশ। আট পনে আধসের আনিয়াছি চিনি। অন্য লোকে ভূরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি।। ইত্যাদি (ঐ, মালিনীর বেসাতির হিসাব দ্রষ্টব্য)

৭। আয়তের চিহ্ন হাতে লোহা একগাছি। (ভারতচন্দ্র, অন্নদামঙ্গল)

৮। তৈল বিনা চুলে জটা খড়ি উড়ে গায়। (ঐ)

৯। আপনি দিলেন হুলু নাড়িচ্ছেদ করি।" (ঐ)

১০। ষষ্ঠীপূজা হইল সায় ছয় মাসে অন্ন খায়। (ঐ)

১১। অতিথি আপনি হবে উপোসি কেমনে রবে অন্নের সংযোগ মোর নাই।
হেন ভাগ্য নাহি যদি অতিথি সেবন করি এই বেলা দেখ আর ঠাঁই।" (

১২। সোহাগী মরিল পুড়ি হরিহোড় লয়ে।" (ঐ)

১৩। সুবচনী পূজে কত ছিড়িয়াছি চুল। (রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর)

১৪। রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দর—বিদ্যার বাসরসজ্জা দ্রষ্টব্য।

হুকায় তামাক সেবন করার রীতি ছিল[১] ; স্ত্রীলোকেরা চিরুনী দ্বারা চুল আঁচড়াইত ললাটে সিন্দুর পরিত[২] ; মৃণ্ময়ী দশভুজার পূজা হইত[৩] ; মাঘ মাসে প্রাতঃস্নান করিবার প্রথা ছিল[৪] ; ফাল্গুন মাসে 'গোবিন্দ দোল' হইত[৫] ; চৈত্র মাসে শুক্ল-পক্ষে অষ্টমী নিশায় অন্নপূর্ণা পূজা হইত[৬] । এই সময়ের রন্ধন-প্রণালীর পরিচয় ভারত-চন্দ্র রায় অতি উজ্জ্বল ভাষায় প্রদান করিয়াছেন । এ স্থলে তাঁহার সেই বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিতেছি,—

"স্নান করি করে রামা অন্নদার ধ্যান। অন্নপূর্ণা রন্ধনে করিলা অধিষ্ঠান ॥
হাস্যমুখী পদ্মমুখী আরম্ভিলা পাক। শড়শড়ি ঘণ্ট ভাজা নানামত শাক ॥
ডালি রাঁধে ঘনতর ছোলা অরহরে। মুগ মাষ বরবটী বাটুলা মটরে ॥
বড়া বড়ী কলা মূলা নারিকেল ভাজা। দুধথোড় ডালনা শুক্তানি ঘণ্টভাজা ॥
কাঁটালের বীজ রান্ধে চিনিরসে বড়া। তিলপিটা সিক্তে লাউ বার্ত্তাকু কুমড়া ॥
নিরামিষ তেইশ রাঁধিলা অনায়াসে। আরম্ভিলা বিবিধ রন্ধন মৎস্য মাসে ॥
কাতলা ভেকুট কই ঝালভাজা কোল। সীকপোড়া ঝুরী কাঁটালের বীজে ঝোল ॥
ঝাল ঝোল ভাজা রান্ধে চিতল ফলই। কই মাগুরের ঝোল ভিন্ন ভাজে কই ॥
মারা সোনা খড়কীর ঝোল ভাজা সার। চিঙড়ীর ঝাল বাঘা অমৃতের তার ॥
কণ্ঠা রাঁধি রাঁধে কই কাতলার মুড়া। তিত দিয়া পচা মাছ রাঁধিলেক গুড়া ॥
আম্র দিয়া সোল মাছ ঝোল চড়চড়ী। আর রাঁধে আদারসে দিয়া ফুলবড়ী ॥
রুই কাতলার তৈলে রাঁধে তিলশাক। মাছের ডিম্বের বড়া মৃতে দেয় ডাক ॥
বাচার করিলা ঝোল খয়রার ভাজা। অমৃত অধিক বলে অমৃতের রাজা ॥
সুমাছ বাছের মাছ আর মাছ যত। ঝাল ঝোল চড়চড়ী ভাজা কৈল কত ॥
বড়া কিছু সিদ্ধ কিছু কাছিমের ডিম। গঙ্গাফল তার নাম অমৃত অসীম ॥
কচি ছাগ মৃগ মাংসে ঝাল ঝোল রসা। কালিয়া দোলমা বাঘা সেকচী সমসা ॥

১। এক সরা ভরা টীকা হুঁকা চলে চুটা। পোড়া দেয় গুড়াকু তামাকু টেকী কুটা ॥ "(ঐ)

২। আঁচড়ে চিরুনে চারু চাঁচর চিকুর। ললাটে সিন্দুর শোভা তম করে দূর। "(ঐ)

৩। মৃণ্ময়ী দশভুজা করিব তাহার পূজা দাসীর বচন রাখ প্রভু। (ঐ)

৪। হেদে প্রাণনাথ কবি মকরে প্রখর রবি এই মাস বিখ্যাত ভুবনে।
প্রাতঃস্নানে মহাপুণ্য করে যেবা সেই ধন্য পারে লোক জিনিতে শমনে। (ঐ)

৫। আর এক শুন বোল ফুল্লেতে গোবিন্দ দোল। (ঐ)

৬। ওরে বাছা হরিহোড় দূর কর ডর। আমি দেবী অন্নপূর্ণা লহ পরিচয়।
চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী নিশায়। করিহ আমার পূজা বিধিব্যবস্থায়। (ঐ)

বগু মাংস সীকভাজা কাবাব করিয়া। রাঁধিলেন মুড়া আগে মশলা পুরিয়া॥
মৎস্য মাংস সাঙ্গ করি অম্বল রাঁধিলা। মৎস্য মূলা বড়াবড়ী চিনি আদি দিলা॥
আম আমসত্ব আর আমসী আচার। চালিতা তেঁতুল কুল আমড়া মান্দার॥
অম্বল রাঁধিয়া রামা আরম্ভিলা পিঠা। সুধা বলে এই সঙ্গে আমি হব মিঠা॥
বড়া এলো আসিকা পাযুষী পুরী পুলি। চুষী রুটী রামরোট মুগের শামুলী॥
কলাবড়া ঝিয়ড় পাপড়ভাজা পুলী। সুধারুচি মুচমুচি লুচি কতগুলি॥
পিঠা হইল পরে পরমান্ন আরম্ভিলা। চালু বিনা ভুরা আর যার চালু দিলা॥
পরমান্ন পরে খেচরান্ন রাঁধে আর। বিষ্ণুভোগ রাঁধিলা রাধুনী লক্ষ্মী যার॥”

৯। উপসংহার

আমরা যত দূর সম্ভব, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবন ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের পরিচয় সংগ্রহ করিলাম। যাহাকে আমরা সাধারণতঃ ইতিহাস বলি, কাব্যের মধ্যে সচরাচর তাহার সন্ধান পাইবার আশা করা যায় না। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমাদের প্রাচীন যুগের সামাজিক রীতি-নীতি, দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা-প্রণালী ও গৃহস্থালীর ইতিহাস সঙ্কলন করা যদি কখনও আবশ্যক হয়, তবে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহার উপকরণের অভাব হইবে না। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য এক বিরাট ব্যাপার; কিন্তু ইহারই অভ্যন্তরে আমাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের পুরাতন চিহ্নগুলি নিহিত রহিয়াছে। ভবিষ্যতে কোন প্রতিভাশালী লেখকের নিপুণ হস্তের সহায়তায় সেই সকল উপাদান সংগৃহীত হইয়া বাঙ্গালীর প্রাচীন যুগের সামাজিক ইতিহাসের একটি প্রধান অধ্যায় বিরচিত হইতে পারিবে—আশা করা যায়।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন